পুঁথির লেখা

আশাপূর্ণা দেবী

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ :
পৌষ : ১৩৬৮

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বোস
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক :
সি. বি. এইচ. প্রসেস (ক্যালকাটা
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নিউ প্রাইমা প্রেস,
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

সুলেখিকা শ্রীমতী মায়া বসু

কল্যাণীয়াসু

নৌকোয় চাপার সময় থেকেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করছেন মুকুন্দ সরকার। লক্ষ্য না করে উপায় নেই বলেই করছেন। কে এই ছেলেটি? এই পথে তো বারোমাসই যাতায়াত তাঁর, কই আর কোনোদিন দেখেছেন বলে তো মনে পড়ছে না। তার মানে ছেলেটি এ অঞ্চলে নতুন আগন্তুক। উঠল অবশ্য চুঁচড়ো থেকেই, মুকুন্দ সরকার যেখান থেকে উঠলেন। কিন্তু স্থির নিশ্চয় ছেলেটি চুঁচড়োর ছেলে নয়। তা হলে কখনো কোনো সময় দেখতে পেতেন।

দু একটা কথা কইতে পেলেই তুখোড় মুকুন্দ সরকার ওর নাড়ি নক্ষত্রের খবর আদায় করে ফেলতে পারবেন। কাদের ছেলে, কাদের জামাই, কী উদ্দেশ্যে নৌকোয় চেপে বসেছে, কোথায় ওর গন্তব্যস্থল। কিন্তু চট করে কথা কওয়া যাচ্ছে না। এতো চুপচাপ আর মনমরা যে চট করে আলাপ করা সম্ভব নয়।

ছইয়ের মধ্যে ঢোকেনি, খোলা পাটাতনে বসেছে ধার ঘেঁসে, মাঝে মাঝে নীচু হয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে গঙ্গা স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে।

বারবারই ছেলেটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করছেন মুকুন্দ সরকার। এবং মনে মনেই বলছেন, একেই বোধহয় বলা চলে 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'।

সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেবকুমার তুল্য কান্তি। মুখের কাঠামো মাজা ঘষা। বাহুল্যবর্জিত, কুঞ্চিত কেশদাম। আঙুলের গঠন লম্বা ছাঁদের এবং এতো দৈন্যপীড়িত শীর্ণ চেহারা সত্ত্বেও নখের আগা রক্তাভ।

হ্যাঁ শীর্ণ। নিতান্তই শীর্ণ! আর সে শীর্ণতায় রোগ ব্যাধির নয়, সম্পূর্ণ দারিদ্র্যের ছাপ। গাত্রবর্ণ গৌর, কিন্তু ত্বকের উপর যেন ভস্মের প্রলেপ, কুঞ্চিত কেশগুলি উপযুক্ত তৈলাভাবে রুক্ষ তামাটে। পরিধানের বস্ত্র উত্তরীয় ফর্সা হলেও, বুঝতে অসুবিধে হয় না বাড়িতে ক্ষারে সিদ্ধ করে কাচা।

ফাগুনের প্রথম। গঙ্গায় হাওয়া উঠেছে। যারা বাইরে বসেছে, তাদের অল্প অল্প শীতবোধ হওয়াই স্বাভাবিক। ছেলেটি তার গায়ের জীর্ণপ্রায় উত্তরীয়খানি টেনেটুনে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একটু গুটিসুটি হয়ে বসলো।—এতে তার পিঠের ও পাঁজরের হাড়গুলি যেন প্রকট হয়ে উঠল।

মুকুন্দ সরকার সংকল্পে স্থির হলেন।

এগিয়ে এসে ছেলেটির পরিচয় নিতে হবে। ও কোথায় যাচ্ছে কে জানে। হয়তো বা জীবিকার চেষ্টায় নবদ্বীপের পথে পাড়ি দিয়েছে, মুকুন্দকে তো নেমে পড়তে হবে। সময় সংক্ষেপ।

এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আর একবার ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন, বছর আঠারো উনিশ বয়স, গোঁফের রেখা পুষ্ট, শীর্ণতার জন্যই বোধ হয় মুখের রেখায় একটা দৃঢ়তার ছাপ। হ্যাঁ, মুকুন্দ সরকারের অনুমান ঠিক। উত্তরীয়ের তলায় যজ্ঞসূত্রের আভাস।

মুকুন্দ মনে মনে ঠিক করছেন প্রথমেই কী সম্বোধনে সম্ভাষণ করবেন, হঠাৎ নৌকোর দাঁড়ি একলাইন গান গেয়ে উঠল, আমি বিজোনে

বিপিনে, প্রবল তুফানে যখন যেখানে থা-কি-ঈ-ঈ—মাগো—মা—আমি বিজোনে বিপিনে-এ এ—

মুকুন্দ সচকিত হয়ে দেখলেন গান শুনে ছেলেটির মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। মুখের সেই নির্লিপ্ত উদাস ভাবটায় একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। আস্তে সরে গিয়ে দাঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছে কী যেন বলল, তারপর নিজের জায়গায় সরে এসে একটি বেতের পেঁটারি খুলল।

এই বেতের পেঁটারিটি এতক্ষণ ওই তরুণ যুবাব পিছনের দিকে ছিল, তাই লক্ষ্য পড়েনি। পেঁটারিটির গায়ে বেশ রঙিন চিত্রবিচিত্র করা, যার মধ্যে ফুল শাঁখ ও স্বস্তিক চিহ্নের আভাস মেলে। তবে ছেলেটির তুলনায় পেঁটারিটির বয়েস বেশী। অতীতের সম্পন্ন অবস্থার বিবর্ণ নিদর্শন।

পেঁটারিটির ডালায় আলতারাফ্ লাগানো। সেটি খুলে ডালা তুলে তরুণ ছেলেটি যা বার করল, সেটা মুকুন্দ সরকারের একেবারে ধারণার বাইরে। বার করল একটি তামার মস্যাধাব, একটি খাগেব কলম ও একগোছা তালপাতা, পুঁথির সাইজে কাটা।

মুকুন্দ সরকারের কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। তিনি আরো এগিয়ে, বলতে গেলে ছেলেটির গায়ের কাছেই গিয়ে দাঁড়ালেন। পাটাতনের উপর আরো অনেক লোক। যে যার আপন আপন পুঁটলী পোঁটলা সামলে বসে। তামাকটামাক খাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছে। এরা বেশীর ভাগই 'ব্যাপারী'। এদের আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তুও ব্যবসা বাণিজ্য ঘেঁষা। একটা বুড়োমত লোক বর্তমানের বাজার দরের অগ্নিমূল্যতা উল্লেখ করে আপন যৌবনকালের বাজার দরের তুলনা করে আপশোস করছিল, আর শ্রোতাদের ঈর্ষা ও বিস্ময় উৎপাদন করছিল।

একপণ কড়িতে এক মণ কলাই বা দেড় মণ ছোলা।

এ যে প্রায় অবিশ্বাস্য।

এই তো সেদিন মধু ব্যাপারী এক পণ কড়িতে দশ সের কলাই কিনে নিয়ে গেছে চুঁচড়ো থেকেই। চুঁচড়োর হাটের গামছা বিখ্যাত, তা' চার গণ্ডা কড়ির কমে একজোড়া গামছা মেলে না।

এরা এখনো সাধাবণতঃ কড়ির বিনিময়েই কাজ কারবার চালিয়ে চলে। তাম্রখণ্ড বা পয়সা শহরের বাজারে আছে বটে, এদেব কাছে দুর্লভ। মুকুন্দ সরকার এদেব সঙ্গে এক নৌকোয় উঠেছেন বলেই যে এদের স্বজাতি তা' তো নয়। কখনো কাউকে ডেকে কথা বলেন না। কিন্তু ওই নতুন আগন্তুক তরুণ যুবাটি। ও যে মুকুন্দ সরকারের থেকেও উচ্চ জাতি, তা যেন ভিতর থেকেই বোধ আসছিল। শুধু ব্রাহ্মণ বলেই নয়, ওর ওই উদাস নির্লিপ্ত মুখেব বেখায় যেন একটি গভীব আভিজাত্য।—মুকুন্দ সরকারের এতক্ষণকাব অনুভূতিব অনুমান দৃঢ় হলো পেঁটারি থেকে বার করা জিনিসগুলি দেখে।

ছেলেটি একবার গলা ঝেড়ে মসীপাত্রের ঢাকনিটি খুলে লেখনিটি চুবিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়ি আবার গান ধরলো,—

বিজোনে বিপিনে, প্রোবোলো তুফানে
যখনো যিখানে এ এ থা-কি
ই ই—মা! মাগো
অভাগারো পরে-যেনো চিরোতরে
জেগে রয় তবো আঁখি। ই ই—মা আ—

মুকুন্দ সরকার সবিস্ময়ে দেখলেন, গানটি তালপাতার পৃষ্ঠায় লেখা হয়ে ফুটে উঠছে।

মুকুন্দ বললেন, কার্য্যব্যপদেশে আমার তো এই পথে নিত্য গতায়াত তা তোমায় তো কখনো দেখিছি বলে মনে পড়ছে না বাপু।

'তোমায় কখনো দেখিনি তো' —এটি বলতে গিয়ে বাচনভঙ্গীর বদল করলেন মুকুন্দ সরকার। তাঁর গুরুর আদেশ মনে পড়ল। গুরুদেবের

শিক্ষা 'নিশ্চিত' ভাবে না জানা থাকলে, কোনো কিছুতেই নিশ্চিতসূচক বাক্য ব্যবহার করবে না।

তরুণ যুবাটির মুখে যেন একটি অস্বস্তির রেখা দেখা দিল। যেন গায়ে পড়ে এই আলাপ করতে আসাটা তার প্রীতিকর হচ্ছে না। কিন্তু মুকুন্দ ওটুকু লক্ষ্য করলেন না। ছেলেটি যখন বিনীত উত্তর দিল, 'না ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে আসিনি'—তখনো তার অনিচ্ছুক ভাব লক্ষ্য না করে বললেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

বর্তমানে উত্তরপাড়া থেকে।

সেখানেই নিবাস?

না। সেখানে জমিদার বাড়িতে জীবিকা অন্বেষণে এসেছিলাম। মনোমত হল না।

সে কি? কেন? উত্তরপাড়ার জমিদার বংশ তো বদান্যতায় বিখ্যাত—

ছেলেটি ঈষৎ বিরক্তভাবে উত্তর দিল, 'বদান্যতা কে চায়? কাজের সন্ধানে এসেছিলাম। লোকমুখে শুনেছিলাম তিনি কিছু পুঁথি নকল করাতে চান—'

পুঁথি নকল!

মুকুন্দ সরকারের ধূর্ত ব্যবসায়ী চোখ দুটোয় হঠাৎ যেন ফস করে একটা চক্‌মকি জ্বলে উঠল!

তুমি পুঁথি নকল করতে পারো?

ছেলেটি তেমনি অনিচ্ছুক ভাবেই বলল, ওর আর পারার কী আছে? ধৈর্য সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।

হুঁ।

মুকুন্দ সরকার যতই বুঝতে পারেন ছেলেটি নিজের সম্পর্কে বেশী কথা বলতে নারাজ, তিনি ততই ছাড়তে রাজী নন। আবার প্রশ্ন, তা উত্তরপাড়ার বাবুরা পুঁথি নকল করালেন না?

না।

ওঃ ! তা' এখন কোনদিকে চলেছ ?

আপাততঃ একবার নবদ্বীপে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি, অতঃপর ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যায়।

মুকুন্দ সরকার একটু কোমল স্বরে বলেন, ঘরে বুঝি জননী নাই ?

না, পিতা মাতা উভয়েই স্বর্গে গেছেন।

ভাই ভগিনী ? অন্যান্য আত্মীয় ?

কেউ নেই।

কেউ নাই ? আশ্চর্য তো ! একথা সত্য ? না কি কোনো কারণে রাগ করে গৃহত্যাগ করেছ ?

ছেলেটি এবার মৃত্বু হাসে।

বলে, রাগ করে গৃহত্যাগ ? ওটা ভাগ্যবানেদের পক্ষেই সাজে। উদরান্নের জন্যই গৃহত্যাগ।

মুকুন্দ আবার বললেন, আশ্চর্য ! তারপর বললেন, তা' নিবাস ছিল কোথায় ?

চাঁপতা গ্রামে।

বিবাহ সংস্কার হয়েছে ? শ্বশুর বাড়ি কোন অঞ্চলে ?

ছেলেটি আবার একটু হাসল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বর্তমানে অক্ষম।

ওঃ তার মানে বিবাহ হয়নি বয়েস কত ?

উনিশ।

মুকুন্দ সরকারের মুখে আসছিল, ব্রাহ্মণ সন্তান, এতোটা বয়েস অবধি বিবাহ হয়নি ? সামলে নিলেন। বুদ্ধির দ্বারাই প্রশ্নের উত্তরটা পেলেন। মা বাপ আত্মবন্ধু কেউ নেই, ঘরে ভাত নেই, নিশ্চিত যে চালচুলোও নেই। অতএব যথাবয়সে বিবাহের প্রশ্ন কোথায় ?

বললেন, তার মানে তুমি এখন নিজেই নিজের মালিক, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট রূপ।

ভাগ্যের খেলা।

তা' বাপু, ভাগ্যের খেলাতেই যখন বিশ্বাসী, তখন আর একবার তার খেলাটা দেখ না ?

অর্থাৎ ?

ছেলেটির ভুরু কুঁচকে ওঠে।

অর্থাৎ নবদ্বীপ যাত্রা বাতিল করে আমার সঙ্গে কাটোয়ায় নেমে পড় না ?

ছেলেটি এই গায়েপড়া বিষয়ী লোকটাকে গোড়া থেকেই পছন্দ করছিল না, এখন আরো অপছন্দ করল।

সেই থেকে এই ভদ্রলোক তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছেন। কী মতলব ? আবার বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেন। শোনা যায় অনেক সময় কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান দেখলে ভুলিয়ে অথবা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে অরক্ষণীয়া কন্যা সম্প্রদান করে ফেলা। একাধিক কন্যাও মজুত থাকে। তেমন কোনো মতলব নেই তো ?

পরক্ষণেই মনে হল, আচ্ছা এ কথা ভাবার তো কোনো হেতু নেই· উনি তো আমার বংশ পরিচয় জানেন না। আমি ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ তাও এখনো প্রকাশ হয়নি। কারণ নাম জিজ্ঞাসা করেন নি। অথচ নৌকোয় ওঠা থেকেই আমায় তীক্ষ্ণ চোখে দেখে চলেছেন।

কোনো পূর্ব পরিচিত জন বলে সন্দেহ করছেন ?

অথবা, অথবা—

দ্বিধার গলায় বলল, আমি তো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মুকুন্দ সরকার একটু হেসে বলেন, ভীতির কারণ নেই। তুমি তো জীবিকান্বেষণেই বেরিয়েছ, এখানে যদি তার ব্যবস্থা হয়ে যায় আপত্তি কি ?

ছেলেটি এখন আর কোনো প্রশ্ন করে না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

মুকুন্দ সরকার বলেন, কালনার জমিদার মল্লিকবাবুরা বিশেষ ধনী, এবং ধর্মপরায়ণ। কাটোয়াতেও তাঁর জমিদারী রয়েছে, বৃহৎ প্রাসাদ

রয়েছে, সাধারণত জমিদারদিগের যে সব বদখেয়াল থাকে, বর্তমান জমিদার শ্রীদেবনারায়ণ মল্লিক মহাশয়ের মধ্যে তার বাষ্পমাত্র নেই। তাঁর যা কিছু অর্থ ব্যয় অন্যান্য বিচিত্র কর্মে। কালনার যে এতো সমৃদ্ধি, তা' মল্লিক বাবুদের দান ধ্যান ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির জন্য।—যাই হোক— বর্তমানে তাঁর একটি খেয়াল হয়েছে কোনো সদব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবতের পুঁথি নকল করিয়ে গৃহে রাখবেন। অথচ তেমনটি পাচ্ছেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় থেকেই অনেকে এ কাজে এগিয়ে আসে, অথবা– অব্রাহ্মণেরা। তোমায় দেখে মনে হলো, এতোদিনে বোধ হয় তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে।

ছেলেটি ধীর ভাবে সবটি শুনে মৃদু হেসে বলে, কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ, এ পরিচয় আপনি পেলেন কখন ?

মুকুন্দ সরকার আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, যখন নৌকোয় চাপলে, তখনই।

ছেলেটি আরও একটু হেসে ফেলে বলে, উপবীত দেখে ?

, না বাপু, চেহারা দেখেই। উপবীত আমার চোখে পড়েছে পরে। মুকুন্দ সরকারের কাজই হচ্ছে লোক চরানো। সে মানুষ দেখলেই চিনতে পারে কে কী ? কিন্তু তোমাকে বাপু চট করে মনঃস্থির করে ফেলতে হবে, কারণ আমার গন্তব্যস্থল প্রায় এসে গেল। মল্লিক বাবুদেরই সেরেস্তায় কাজ করি আমি।

ছেলেটি তবুও দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, কিন্তু হঠাৎ এখানে নেমে পড়ে কোথায় থাকবো, কী ব্যবস্থা হবে না জেনে—

নবদ্বীপে কোনো আত্মীয় আছে ?

পৃথিবীতে আমার কোনো আত্মীয় নেই।

গভীর গম্ভীর উত্তর দেয় যুবা।

তবে সেখানে কোথায় গিয়ে উঠবে মনস্থ করেছ ?

ওখানে আমার স্বর্গত পিতার একটি গুরুভ্রাতা আছেন, শুনেছি তিনি একটি টোল খুলেছেন, যদি সেখানে—

সংস্কৃত জ্ঞান আছে ?

অল্প স্বল্প ।

অতি উত্তম। ধরে নাও এখানেও তেমন ব্যবস্থা হতে পারে। মল্লিকবাবুর সে ইচ্ছাও আছে। আর কোথায় উঠবে না জেনে সাহস পাচ্ছ না ?

মুকুন্দ সরকার ঈষৎ হেসে বলেন, আমার সঙ্গে যখন যাচ্ছই, সে প্রশ্নের অবকাশ কোথায় ? তবে যদি আমাকে তোমার সন্দেহ হয় তো আলাদা কথা। তা আমায় দেখে কি বাপু তোমার ডাকাত সর্দার বলে মনে হচ্ছে ? তা' যদি হয়ে থাকে, এই সব লোকজনদের জিগ্যেস করে দেখতে পারো। নিত্য এই পথে গতায়াত।

ছেলেটি লজ্জিতভাবে বলল, ছি ছি, এ কী বলছেন ?

বেশ তা' হলে মন প্রস্তুত ?

ছেলেটি মাথা কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে আস্তে বলে, কিন্তু আমি যে কে, কী প্রকৃতি, কী আমার পরিচয় সেটা না জেনেই—

সব জেনেছি —

মুকুন্দ সরকার বলে ওঠেন, তবু তোমার সন্তোষের জন্যেই জিজ্ঞাসা করি—নিবাস তো চাঁপতা গ্রাম, পিতার নাম ?

ঈশ্বর সদাশিব বন্দ্যো—

পিতামহের ?

ঈশ্বর নিত্যশিব বন্দ্যো—প্রপিতামহ, ঈশ্বর সত্যশিব বন্দ্যো—বৃদ্ধ প্রপিতা—

থাক থাক ওতেই হবে যথেষ্ট। তোমার নিজের নামটি ?

বলেই তাড়াতাড়ি হেসে বলে ওঠেন, দেখো বাপু, তালে তাল মিলোতে যেন নিজের নামের আগেও 'ঈশ্বর' বসিয়ে বোসো না।

হা হা করে হেসে ওঠেন।

তার মানে লোকটি রসিক আছেন।

ছেলেটিও প্রায় শব্দ করেই হেসে ফেলে বলে, সাবধান না করলেও ক্ষতি ছিল না। নিজেকে প্রায় মৃতের কোঠাতেই ফেলে রেখেছি। যাক সাবধান যখন করলেনই—নাম শ্রীশুক্লশিব বন্দ্যো—

মুকুন্দ বলেন, এই তো মুস্কিল। যাঁদের উচ্চারণের প্রয়োজন নেই তাঁদের নামগুলি তো খাসা সরল। যাকে সর্বদা ডাকতে হবে তার নামটিই দাঁত ভাঙা ?—শুক্লশিব। ও বাবা।

ভদ্রলোকের নামটা তখন কথার মাঝখানে জেনে নিয়েছে ছেলেটি। বুঝলো এই মুকুন্দ সরকার ইচ্ছে করেই এমন চপল হাস্য পরিহাস করছেন যাতে তার মনটা ওঁর সঙ্গ গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

একটু হেসে বলল, এমন কি শক্ত ?

তা' বাপু সর্বদা বলার পক্ষে একটু শক্ত আছে। এই পোষাকী নাম ছাড়া আর কোনো নাম নেই ?

ছেলেটি হঠাৎ মলিন হয়ে যায়।

গাঢ় কণ্ঠে বলে, ঠাকুর সম্পূর্ণ নামটি ধরেই ডাকতেন, মাতাঠাকুরাণী ডাকতেন শিবচন্দ্র।

মুকুন্দ সরকার বললেন, দেখি কোনটি রপ্ত করতে পারি। এই গরীবের কুঁড়েতেই তোমায় অবস্থান করিতে হবে বুঝতে পারছ বোধহয় ?

অনুমান করছি।

তোমার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার চেষ্টা করবো।

অসুবিধা ? আমার ?

ছেলেটির মুখে একটি করুণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসিটুকুর মধ্যেই অনেক কিছুই ব্যক্ত হয়।

নৌকো ঘাটের কাছে এসে ভিড়েছে।

বহু কণ্ঠের কলরবে তীর মুখরিত হয়ে ওঠে

মুকুন্দ সরকার নিজের যৎসামান্য পুঁটলীটি বাগিয়ে ধরেন, শুক্লশিব তার পেঁটারিটি তুলে বুকের কাছে চেপে নেয় নামবার উপক্রমে। নৌকো প্রবল বেগে দুলছে, যতক্ষণ না নোঙর হবে ততক্ষণ এই ভাবে দুলবে। যাত্রীরা টলটলায়মান অবস্থান এগিয়ে যাচ্ছে ধারের দিকে।

মুকুন্দ সরকার বলেন, মানুষের প্রকৃতি কী অসহিষ্ণু! আর কিছুক্ষণ পরেই নৌকোয় স্থিরতা আসবে, সেই ক্ষণটুকু অপেক্ষা করতে রাজী নয়। ওদের নামতে দাও, আমরা পরে নামবো।

শুক্লশিবের এখন মনে হল এই লোকটির সঙ্গে তার ধাতের মিল হবে।

মুকুন্দ সরকার বললেন, আমার গৃহে তোমার কোনো অস্বস্তি হবে না বলে আশা করছি। পরিবারের লোকসংখ্যা খুবই কম। আমার কোনো পুত্র সন্তান নেই, তিনটিই কন্যা সন্তান, তাদের বিবাহাদি হয়ে গেছে। নিজ নিজ শ্বশুর বাড়িতে আছে। একটি শিশু দৌহিত্র এখানে তার মাতামহীর কাছে পালিত হচ্ছে। সেই শিশুটি এবং এই দুই বুড়োবুড়ি। আর—এই যে নৌকো স্থির হয়েছে। এসো অবতরণ করা যাক।

শুক্লশিবের মনে হলো, 'আর' কারো কথা বলতে গিয়ে বললেন না উনি। ব্যস্ততায়? না ইচ্ছা করে?

বিনয় করে গরীবের কুঁড়ে বললেও মুকুন্দ সরকারের বাড়িখানি আড়ে দীর্ঘে কম নয়। বহির্বাটি, ভিতরবাটি, দুই প্রস্থ উঠোন, দু প্রস্থ দালানকোঠা, ওদিকে রান্নাশালা, পিছনে গোয়াল ঢেঁকিঘর ইত্যাদি। অবশ্য দোতলা নয়, সবই একতলা। মুকুন্দর মতে দোতলাটা যেন ঔদ্ধত্যের মত দেখতে লাগে। জমিদার বাড়ির এতো কাছাকাছি ওটা শোভা পায় না।

॥ দুই ॥

এ বাড়িতে ঢোকার সময় শুক্লশিবের মনে হচ্ছিল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। এই বাড়িতে সে আশ্রয় পাচ্ছে? এবং কাঙালের আশ্রয়লাভের মত নয়, স্বয়ং গৃহকর্তার সাদর আমন্ত্রণঘটিত আশ্রয়। স্বপ্ন ছাড়া আর কী? মাতৃপিতৃহীন একটা বালক, নিকট জ্ঞাতিদিগের নিষ্ঠুরতা আর বিশ্বাসঘাতকতার নির্লজ্জ দৃশ্যের মাঝখানে বড় হতে হয়েছে। মনের মধ্যে তিল তিল করে জমে উঠেছে হতাশা আর পৃথিবী সম্পর্কে অবিশ্বাস।

প্রতিদিন প্রতিবেলা অবজ্ঞার ভাত খেতে খেতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, একটু বড় হলেই সে তার পরিচিত গ্রাম পথ ভিটেবাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবে।

ষোলো বছর না হতেই বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। অনেক দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হতে হতে আজ বয়েসকে ঠেলে নিয়ে এসেছে উনিশের কোঠায়। নিঃস্ব নিরুপায় হতভাগ্য যুবা অনিশ্চিতের পথে রওনা দিয়েছিল, অন্ধকার ভবিষ্যৎকে সামনে ঝুলিয়ে। নৌকো পারানির কড়ি ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল, স্বয়ং ভগবান মানুষের মূর্তি ধরে হাতে ধরে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন আশ্রয়। হতভাগ্য যুবা বুঝি এইবার পায়ের তলায় মাটি পেল, মাথার উপর ছাদ। আর পেল, উপার্জনের আশ্বাস। বহির্বাটির

উঠোন থেকে বৈঠকখানা ঘরে এসে ফরাসে বসবার পর এই কথাগুলো ভেবে চলেছিল শুক্লশিব।

হঠাৎ আবার নিজস্ব হতাশার দৃষ্টিভঙ্গি ফিরে এল, ভাবল অভাগার ভাগ্য। এই দণ্ডেই হয়তো ভেঙে যাবে এই সুখের স্বপন। উত্তরপাড়ায় বাবুদের বাড়িতে ঢুকেও তো আশার ছলনায় ভুলেছিলাম। সে বাড়ি তো রাজপ্রাসাদ সদৃশ আধখানা গ্রাম জুড়ে বাড়ি।

অবশ্য মূল বাড়ির কোনোখানে ঠাঁই হয়নি শুক্লশিবের। আশ্রয় মিলেছিল বাইরে অতিথিশালায়। বিরাট দোতলা, তার সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরি। তাই পেয়েই কৃতার্থ বোধ করেছিল. যেন অতিথিশালায় ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা বিভাগ। সেখানে স্বপাকের ব্যবস্থা অনুযায়ী বাসনপত্র ইত্যাদি মজুদ নিত্য দু'বেলা সিধে আসে। নিশ্চিত অন্নের এমন সুখ অনেকদিন ভাগ্যে জোটেনি।

কিন্তু সুখ সইল না।

দিনের পর দিন কেটে যায়, পুঁথি নকলের কাজের ব্যবস্থার জন্য ডাক আর পড়ে না। কোথায় জমিদারবাবু, কোথায় হতভাগ্য শুক্লশিব। ভৃত্যজন ব্যতীত কারো সঙ্গে দেখাই হয় না। নায়েব গোমস্তা সরকার দেওয়ান ইত্যাদি নামগুলি কদাচ কানে আসে। কিন্তু কাউকে একবার ধরে ফেলে কাজের কথা কইবার সুবিধে হয় না।

যারা সিধে দিতে আসে, তাদের অনুরোধ উপরোধ করে, কিন্তু তারা যে বিশেষ গা করে তা মনে হয় না। 'রজনী' নামের একটা লোক তো শুক্লশিবকে বলেই দিল একদিন, 'কাজ কাজ' করে হাঁপাচ্চো ক্যানো ঠাকুর? কাজের অভাবে কী বোয়ে যাচ্ছে তোমার? দিব্যি খাচ্চো, মাকচো। নিত্য গঙ্গাচান কচ্চো, গায়ে হাওয়া দে ঘুরে বেড়াচ্চো, কষ্টটা কী? বাউনের ঘরে জন্মানোর পুণ্যিতে সারা জেবনটাই এই ভাবে তরে যেতে পারো। এখেনে অতিথিশালায় সে ব্যবস্থা আছে। সাধু সন্তো বাউল বোষ্টম, যার য্যাতোদিন ইচ্ছে থাকতে পাবে। নেয়ম সেবার মতন সিদে পাবে। তবে? এই রজনীর যদি এমন কপাল

হতো, তালে এহোজন্মে কাজের নাম করত না তা শুদ্দুরের কপালেই তেঁতুলগোলা। হাড় পেষাই না করে অন্ন জুটবে না। চুপচাপ থেকে যাও।

সদুপদেশই দিয়েছিল রজনী।

কিন্তু সকলের তো আবার সদুপদেশ সয় না।

চেষ্টা করে একদিন সরকার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের আর্জি জানালো। তিনি আবার জমিদার মশাইয়ের মেজাজ মাফিক কথাটার উত্তর আদায় করে শুক্লশিবকে জানালেন। উত্তর উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়।

ওঁরা জানিয়েছেন, হ্যাঁ পুঁথি নকলের জন্য দিকে দিকে খবর পাঠিয়েছিলেন বটে কিছু দিন আগে, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। কোম্পানীর সাহেবরা শ্রীরামপুরে এমন এক যন্ত্র বসিয়েছে যে, তাতে এক সঙ্গে শত শত পুঁথি মিলবে। অতএব—

শুক্লশিব বলল, আচ্ছা নমস্কার।

আহা, তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ার কী দরকার? থাকতে পারো যতোদিন ইচ্ছে। জমিদারও উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ কুলের মুখুটি 'মুখোপাধ্যায়'। তাঁর দান নিতে আপত্তির কিছু নেই। এই তো সামনেই কর্তার মাতৃ শ্রাদ্ধের 'বাৎসরিক' আসছে। 'ব্রাহ্মণ বিদায়' হবে। একজোড়া করে ধুতি ও একজোড়া করে গামছা, তা ছাড়া নগদ একটি করে টাকা। এ ছেড়ে কেউ চলে যায়! মহামুর্খ ব্যতীত যায় না।

কিন্তু শুক্লশিব মহামুর্খের কাজই করে বসল।

বলল, শুধু বসে বসে দাতব্যের ভাত খাবো? পোষাবে না।

বেশ, না পোষায় বলার কিছু নেই।

প্রায় মাস দেড়েক বাসের পর আবার অনির্দেশ যাত্রা! সেইখান থেকে এইখান।

মুকুন্দ সরকার বললে, এখন উভয়েরই স্নানের প্রয়োজন। আমার লোকজন তোমায় ঘাটেলাবাঁধানো পুষ্করিণী দেখিয়ে দেবে। স্নান সেরে জলপান করে প্রস্তুত হয়ে বাবু মশাইয়ের কাছে নিয়ে যাব।—আর মধ্যাহ্ন ভোজ ? সে তো এই অধমের বাড়িতে হবে না, সে ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি। স্থানীয় দেববিগ্রহের মন্দিরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, 'বৃন্দাবন চন্দ্রের' ভোগের প্রসাদের জন্য। ব্রাহ্মণ সেবাইত দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

শুক্লশিব কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, এতোকিছু আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। আমি নিজেই ত্নটো ফুটিয়ে নিতে পারতাম।

মুকুন্দ হেসে বলেন, তা পারতে অবশ্যই। অতঃপর পারতে হবেও। তবে প্রথমটা দু' চারদিন 'ভোগ প্রসাদেই চলুক না। প্রসাদের অন্ন দেহে অমৃতের কাজ করে।

কোনো একজন ভৃত্যকে ডেকে নতুন বামুনঠাকুর মশাইয়ের ব্যবস্থা করতে বলে মুকুন্দ সরকার বলেন, আচ্ছা আমায় এবার অনুমতি কর বাবা—

বলেই হঠাৎ আভূমি নত হয়ে খপ করে পায়ের ধূলো নিয়ে বসেন।

এ কী! এ কী! ছি ছি! এটা কী করলেন ?

যদিও ব্যাপারটা অনভ্যস্ত নয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্মানোর সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রণাম পাওয়ার অভ্যাস আছে।

চাঁপতার বুড়ি দত্ত ঠানদি তো প্রতিদিন সকালে এসে জলগ্রহণের আগে 'বালক ব্রাহ্মণের চরণধূলো' নিয়ে মাথায় বুকে এবং জিভে ঠেকিয়ে যেত। আশ্চর্য, শুক্লশিবের জ্ঞাতি জ্যাঠার ছেলেরাও তো থাকতো কাছে পিঠে, বুড়ি তাদের দিকে ঘেঁষত না।

কোনোদিন শুক্লর স্নানের দেরী হয়ে গেলে বসে থাকতো।

নেই। তাই বিন্দুবাসিনী স্বামীর এ নির্দেশে বিব্রত বোধ করেন এবং একথাও জানান, রেঁধে ভাত বেড়ে তো দিতে যাচ্ছেন না, ঠাকুর তো স্বপাকেই খাবে। তবে আর কোন কাজে সামনে বেরোনো ?

মুকুন্দ গাঢ় স্বরে বলেছেন, অল্প বয়েস, মাতৃহীন, তোমাব কাছে একটু মায়ের স্নেহ পাবে, এই আর কি।

অতএব—

এই ব্যবস্থা। ভিতর বাড়িতেই ডাকিয়ে আনা হলো শুক্লশিবকে।

সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা পাখা হাতে বিন্দুবাসিনীর দিকে দৃষ্টি ফেলে মুকুন্দ সহাস্যে বলেন, তোমাব এই মা'টির লজ্জা কিছু অধিক। বলেছি ঘরের ছেলের কাছে লজ্জা করলে চলবে কেন ? সংসারের গিন্নী তুমি, এতো কলা বৌ হ'লে মানায় না। কি বল ? ঠিক বলিনি ? সামনে এনে বসিয়ে দিয়েছি।

এ কথার আর কী উত্তর ?

শুক্লশিব আস্তে বলে, এতো বেশি ফল টল—কমিয়ে দিলে ভাল হয়।

মুকুন্দ আঁ আঁ করে উঠেন, না না। সে হবে না, এতো বেলা হয়ে গেছে—

তা হলে কিন্তু মধ্যাহ্নভোজটা বাদ দিতে হবে।

মুকুন্দ ফলে কামড় দিতে দিতে আলগোছে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, সে তো হতেই পারে না, স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্রের ভোগ প্রসাদ।

শুক্লও লজ্জিত হয়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

তবে আবার সেই কমানোর প্রশ্ন।

রসিক মুকুন্দ সরকার হেসে উঠে বলেন, বামুন যে 'ভোজনে' হারে, এ তো কখনো শুনি নাই বাপু।

তা হলে আমাকে 'বামুন' নামের অযোগ্য বলে ধরবেন।

না বাপু ! ও বললে শুনব না। বাবুদের কাছ থেকে ঘুরে আসতে বিলম্ব হতে পারে। প্রসাদও দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ না হলে পাওয়া যায় না। সামান্য কিছু ফলমূল বৈ তো না।

এই যদি 'সামান্য' হয়, অসামান্য কী হবে ?

পাখা নড়া হাত থেমে যায়।

ঘোমটার মধ্যে থেকে ফিস ফিস আওয়াজ, ঠাকুরকে বল, হাত দিতে। ব্রাহ্মণের পেসাদ পাবার লোক আছে।'

লোক আছে।

অদূরবর্তী অন্তরালেই আছে।

পাতের প্রসাদ টসাদ খাওয়ার অভ্যাস আছে তার। মুকুন্দ দম্পতির সংক্ষিপ্ত সংসারের মধ্যে এসে পড়া ফালতু মাল। ওঁদের পাতের খেয়েই অর্ধেক কাজ মিটে যায়। আর এতো ব্রাহ্মণের প্রসাদ।

বিন্দুবাসিনী যখনি স্বামীর জন্য অথবা নিজের জন্য আহার্য গোছান, ইচ্ছে করেই বেশী করে চাপিয়ে রাখেন। বাড়তিটা যদি কেউ বাড়তি হিসেবে খায়, তাতে কারো নজর লাগে না। পিতৃকুলের একটা আপদ এসে ঘাড়ে পড়ায় বিন্দুবাসিনী বিব্রত বৈ কি। কেউ নেই সংসারে তবু যেন প্রত্যক্ষ স্নেহ প্রকাশে চক্ষুলজ্জা আসে। এই যে নানাবিধ ফল ইত্যাদি দিয়ে দুটি পাত সাজালেন, তেমনভাবে সাজিয়ে কি ওই অখাদ্য প্রাণীটাকে ধরে দেওয়া সম্ভব ? দিলে সেও লজ্জা পাবে। তার থেকে এঁদের পাতে চাপিয়ে রাখলে—ফেলা যাবার ভয়ে—

মুকুন্দও শেষ অবধি কিছুটা হারলেন। কারণ তাঁর আবার ওই ফলের সঙ্গে বাড়তি এক বাটি মুড়ি ছিল।

শুক্লশিবের রুচিতে এটা খাপ খায় না, কেউ তার প্রসাদ খায়। তবু আর কত লড়বে ? তবে 'ব্রাহ্মণের পেসাদ খাবার লোক আচে' শুনে

তার চোখের সামনে জগন্নাথের নিকষকৃষ্ণ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারাটা ভেসে উঠল। যাক গে, মরুকগে।

অন্তরালে থেকে যে একজন বিস্ফারিত নেত্রে নবাগত অতিথিকে দেখছে সে কথা শুক্কুর ধারণায় আসার কথা নয়। জানার কথা নয় ঠিক দরজার ওপিঠেই একটা হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে।

এই বাউন ঠাকুর। 'একেই নিয়ে এসেছে পিসে?'

বরাবরের জন্যে নাকি থাকবে।

শুনে পর্যন্ত বুকটা থর থর করছে তার। পিসের আবার এ কী বিপদ ডেকে আনা। সকালে যখন শুনেছিল পিসে কোন বামুনকে নিয়ে এসেছে, তার জন্যে 'ঠাকুর বাড়িতে' ভোগের কথা বলতে যেতে হবে। তখন—তুলসীর মনের মধ্যে যে ছাপটা পড়েছিল সেটা ওই ঠাকুর বাড়ির অনঙ্গ ভটচার্য বা গদাই চক্কোত্তির কাছাকাছি।

তার পরিবর্তে এ কী। পিসের পাশে বসে আছে আকাশ থেকে খসে পড়া একটুকরো চাঁদের কণা!

॥ তিন ॥

বাবুদের বাড়িতে ঢোকবার সময় মুকুন্দ সরকারের বুকটা আহ্লাদে স্ফীত হচ্ছিল। দেখুন বাবু পথ থেকে কী নিধি কুড়িয়ে এনেছে মুকুন্দ। মুকুন্দ যদি নৌকোয় সেই তালপাতার পাতে মাঝির গান লিখে নেওয়াটি না দেখতেন এতো স্থির নিশ্চিত হতে পারতেন না। তার উপর এই সোনার গৌরাঙ্গ সদৃশ রূপ। যেন সোনায় সোহাগা।

একটু তৈল সহযোগে স্নান, একটু কেশবিন্যাস, একটু স্নিগ্ধ ফলজল আহার, একটি কাচা ধুতি, উড়ুনি এবং কর্দম মদিত খড়মে একটু মার্জনার প্রলেপ। এইটুকুতেই যেন বহ্নির উপরিস্থিত সেই আচ্ছাদনটি মুছে গেছে।

বাবুদেব বাড়ি যাত্রার অভিমুখে পথে দু একজনের সঙ্গে দেখা হল, সকলেই সচকিত হল। এ তো মুকুন্দর কেউ হতে পারে না। গলায় পৈতেই তার সাক্ষী।

শুক্লশিবের হাতে কয়েকখানি তালপাতা ফর্সা ন্যাকড়ায় মোড়া।

মস্যাধারটি নিতে চেয়েছিল, মুকুন্দ সরকার বলেছিলেন, না না, দরকার হবে না। বাবুদের বাড়িতে ও বস্তুর অপ্রতুলতা নাই।

প্রণাম নয়—বৈদ্য জাতি সহজে নত হয় না।

শিবেন্দ্রনারায়ণ সসম্ভ্রমে 'নমস্কার' জানিয়ে সানন্দ মুখে বললেন, 'আগে দর্শনধারী তবে গুণবিচারি।' তা' দর্শনটি তো বেশ ভালই দেখছি মুকুন্দ। গুণের পরখটাও হয়ে যাক—নামটি কি বাপু?

শ্রীশুক্লশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

চকিত হলেন দেবনারায়ণ।

বড় সৌখীন ধরনের নামটি তো।

গোপাল, গোবিন্দ, গদাধর, কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবন, অথবা তারাপদ, শ্যামাচরণ, কালীপ্রসন্ন, এই ধরনের একটা কিছু শুনবেন আশা করে ছিলেন। নাম থেকেই চট করে ধরে ফেলা যায়, শাক্ত পরিবারের সন্তান,—না বৈষ্ণব পরিবারের। এ থেকে চট করে বোঝা গেল না।

বললেন, বাঃ। এ নাম কে রেখেছিল?

শুক্লশিব মাথা নীচু করে বলে, পিতা।

তাঁর নামটিও বোধহয়—

হ্যাঁ, তাঁর নাম ছিল ঈশ্বর সদাশিব বন্দোপাধ্যায়।

দেবনারায়ণ আর পিতামহ প্রপিতামহের দিকে গেলেন না. বললেন, পুঁথি নকল করতে সক্ষম?

পরীক্ষা করে নেবেন।

ইতিপূর্বে করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নাটোরের রাজবাটি থেকে চৈতন্যমঙ্গল নকল করার কাজ পেয়েছিলাম। বেশ খানিকটা করাব পর হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা চলে গেল। বললেন, এখন থাক।

হুঁ। আর?

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি বলেন, উত্তরপাড়া রাজবাড়িতেও আশ্বাস পেয়ে গিয়েছিলেন ইনি, তারাও ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

দেবনারায়ণ নড়ে চড়ে বসে বললেন, কেন বল তো?

শুক্লশিব ধীরগলায় বলল, শুনলাম, কোম্পানীর সাহেবরা শ্রীরামপুরে কি যন্ত্র নির্মাণ করে একসঙ্গে অনেক পুঁথি নকল করবার চেষ্টা করছে।

দেবনারায়ণ মৃদু হাসলেন, বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, নাকি মুদ্রণ যন্ত্রের চেষ্টা চলছে। কিন্তু পবিত্র পুঁথিগুলি কি সেভাবে মুদ্রিত করে পাঠের কাজে লাগানো যাবে? দেবদেবীর পূজা মন্ত্রগুলি যদি বিলাইতি

কাগজে মুদ্রিত হয়ে ইতর সাধারণের হাতে হাতে ফেরে, মন্ত্রের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বজায় থাকবে ?

এ প্রশ্ন অন্য কাউকে নয়, নিজেকেই।

কাজেই উত্তর আসে না।

দেবনারায়ণ অন্যমনস্কতা ত্যাগ করে বলেন, আচ্ছা তোমার সঙ্গে তো তালপত্র দেখছি। এই মস্যাধার ও লেখনী নিয়ে নিজের নামটি স্বাক্ষর কর তো। হরফের ছাঁদ দেখি।

শুক্লশিব আস্তে বাঁধন খুলে তালপাতা বার করে সঙ্গের কাঠের 'পাটা'র উপর রাখে। কাছেই রক্ষিত কলম ও দোয়াত কাছে সরিয়ে নেয়, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, পরীক্ষা কালে অগ্রে দেবদেবীর ও মাতাপিতার নাম লেখা বিধি, যদি অনুমতি করেন—

দেবনারায়ণ এই শিক্ষিত মার্জিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন যুবার প্রতি রীতিমত আকৃষ্ট হন। পুঁথির শখ তাঁর বরাবরের।

বহু চেষ্টায়, বহু ব্যয়ে আর বহুকাল ধরে দেবনারায়ণ পুঁথির একটি বিরাট ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন আর সেটি তাঁর এই কাটোয়ার বাড়িতেই কাটোয়ার বাটি প্রকৃত পক্ষে তাঁর বিশ্রাম নিকেতন ও পাঠচর্চার ক্ষেত্র।

কালনার বাটিতে বহু লোকজন, বহু কর্মকাণ্ড, তাই মাঝে মাঝেই এখানে এসে বাস করে যান।

গৃহিণী গত হয়েছেন। পুত্র পুত্রবধূদিগের হাতে সর্ববিধ ভার ন্যস্ত করে আসেন, তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যও বটে। কী ভাবে তারা চালায়, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকে কিনা, ব্যবসা বাণিজ্যের হার কেমন হয়, সবই লক্ষ্য করেন, তবে কিছুটা নির্লিপ্ত ভাবে।

কাটোয়ার এই বাটিতে একটি বৃহৎ কক্ষ পুঁথির ভাণ্ডার হিসেবেই আছে। পুঁথি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থাও যথেষ্ট। ভিতরে তামার পাতমোড়া বৃহৎ বৃহৎ পেটিকার মধ্যে পুঁথিগুলি রাখা থাকে। তাদের

উপর কর্পূরও অন্যান্য মশলা দ্বারা প্রস্তুত আরক ছড়ানো হয়, এবং রীতিমত ভারী মজবুত তালা ব্যবহার করা হয় পেটিকাগুলিতে। কেবলমাত্র ঘুণ বা পোকা থেকে রক্ষা করলেই তো হবে না চোরের দৃষ্টি থেকেও করতে হবে। পুঁথি চুরি যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়।

তা এই 'পুথি' সংগ্রহের নেশায় অনেক-নকলকারী দেখেছেন দেব-নারায়ণ, অর্থের বিনিময়ে বিশিষ্ট পণ্ডিতজনও কাজ করে গেছেন, কিন্তু এমনটি যেন আর দেখেননি। প্রসন্ন মুখে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। মুকুন্দ আমরা কিছুক্ষণ নীরবতা গ্রহণ করি। অপরের কণ্ঠস্বরে চিত্তেব বিক্ষিপ্ততা ঘটে।

শুক্লশিব লজ্জিত হয়, কুণ্ঠিতভাবে বলে, না না। তাব দরকাব নেই। আমি নিজ মনে লিখবো।

অতঃপর দ্রুত অথচ পরিস্কার ছাঁদে লিখে ফেলে-প্রণামি হে বাগ-দেবী প্রণমি চরণে। সতত রাখিও দয়া জীবনে মরণে।

পিতা সদাশিব বন্দ্যো—জননী অভয়া।
অধম সন্তান প্রতি ছিল বড় দয়া।
ভাগ্যদোষে অতিবাল্যে হারাইনু পিতা।
জননী পরমা সতী, হন সহমৃতা।
জন্মভূমি গ্রামখানি চাঁপতা নামে খ্যাত।
গঙ্গাতীরে জিলা হুগলী মধ্যে অবস্থিত।
গৃহ ত্যেজি ভ্রমি, নাম শুক্লশিব বন্দ্যো।
রচিলাম পরিচয় পয়ারের ছন্দ।

নতমুখে তালপত্রখানি এগিয়ে দেয় দেবনারায়ণের দিকে।

মন দিয়ে দেখেন দেবনারায়ণ।

বড় প্রসন্ন হন। বিস্মিতও। বলেন, এখন এই দণ্ডে এটি লিখে ফেললে?

ইচ্ছে করলেই বাহাদুরীটা নিতে পারত শুক্লশিব। কিন্তু নিল না। মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, আজ্ঞে না। নাটোরের পুঁথির নকল সমাপ্ত হলে ভণিতা দেবার ইচ্ছায় ওটি রচনা করে রেখেছিলাম। কিন্তু পুঁথি শেষ করবার সুযোগ হল না।

দেবনারায়ণ বলেন, এখানে সুযোগ পাবে। আমার আশা অনেক বিস্তৃত। এখন 'শ্রীশ্রীভাগবত' গ্রন্থ নিয়ে কাজ কর। অতঃপর—

বাকচতুর মুকুন্দ সরকার বাবুর সামনে চুপচাপ এখন বলেন, অতঃপর তুমি সমুদ্র প্রমাণ কাজ পাবে। এই গৃহের একটি বিশাল কক্ষ কেবলমাত্র পুঁথির পেটিকায় বোঝাই। দেখো একদিন। তবু রাজাবাবুর আগ্রহের অবধি নাই।

দেবনারায়ণ বলেন, মুকুন্দ, তোমার এই 'রাজাবাবু' বলার অভ্যাসটা ছাড়বে ?

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, ভুলক্রমে আজ্ঞে—

রোজই ভুলক্রম। যাক ব্রাহ্মণ সন্তানের আহারের কী ব্যবস্থা করেছ ? তোমার গৃহে বা আমার গৃহে, কোনো ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করিয়ে—

মুকুন্দ বলেন, না, ইনি স্বপাকেই খাবেন। দু' একদিন বৃন্দাবন চন্দ্রের ভোগের প্রসাদ আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছি।

অতি উত্তম।

দেবনারায়ণ বলেন, একটা দিন ইনি বিশ্রাম করুন। আগামী পরশু তারিখে শুভ শুক্রবার হতে কাজ শুরু হবে। কী বল ?

মুকুন্দ বলে, এ তো অতি উত্তম কথা।

দেবনারায়ণ মৃদু হাস্যে বলেন, শুক্লশিব। বৈদ্যরাও ব্রাহ্মণ। যজ্ঞোপবীতের অধিকারী। আয়ুর্বেদও বেদ। লোকাচারজনিত কুপ্রথায় বৈদ্যজাতি একটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় অবস্থিত। কাজেই ব্রাহ্মণ সেবার ব্যবস্থা আমার গৃহ হতেই হতে পারতো। যাক স্বপাকের মত উত্তম আর কী আছে ?

এই বলেই মনকে শান্ত করলেন দেবনারায়ণ।

কিন্তু যদি না করতেন।

যদি নিজ গৃহ হতেই নবাগত ব্রাহ্মণের আহারের বন্দোবস্ত করতেন। তা হলে হয়তো ঘটনাচক্রের চাকা এক অজানিত পথে ধাবিত হতো না। কিন্তু চক্রীর ইচ্ছা অনুসারেই তো কাজ।

মুকুন্দ সরকারের বাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হল শুক্লশিব। এবং দাসদাসীগণের সুবিধার্থে 'শিবু ঠাকুর' নামে খ্যাত হল। দেবনারায়ণ অবশ্য পুরো নামটি ধবেই ডাকতে ভালোবাসেন।

অতি প্রত্যূষে উঠেই স্নান সেরে, যৎসামান্য ভিজে ছোলা গুড় সহযোগে গ্রহণ করে বড় এক গ্লাস জল খেয়ে মল্লিকবাটিতে রওনা দেয় শুক্লশিব। সেখানে পুঁথিঘরের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত। সে ঘবের এক প্রান্তে তার জন্য একটি জলচৌকীব উপর লেখনীর গোছা এবং মাফিকসই তালপাতার স্তূপ রক্ষিত থাকে, থাকে রৌপ্যনির্মিত মস্যাধার।

শুক্লশিব গিয়েই নিজের কাজে বসে পড়ে। তার লেখা দ্রুত, হরফ স্পষ্ট গোটা গোটা। এবং 'নকল' একেবারে নির্ভুল। দেবনারায়ণ বড় খুসী। এক প্রহর অতীত হলেই দেবনারায়ণ এসে হাজির হন। বলেন, এবার একটু গা তুলতে হবে বাপু।

এ আর কিছু নয়, জলযোগের সঙ্কেত।

প্রহর উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই এটি করতেই হয় শুক্লশিবকে। ডাব ফল মিষ্টান্ন গোছানো থাকে। শুক্লশিবের আপত্তি গ্রাহ্য হয় না।

দেবনারায়ণ পুঁথির পাতাগুলি নিরীক্ষণ করেন। আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রায়ই বলেন, সেই ভনিতাটি তুলে রেখো বাপু। গ্রন্থ সমাপ্ত হলে সেটির প্রয়োজন হবে। পুঁথির সঙ্গে এরকম থাকা খুব দরকার। না থাকলে ভবিষ্যতে কেউ জানতেও পারবে না, কে এই পূর্ণ্য কর্মটির

শরীক। হারিয়ে যাবে নাম। সন তারিখ বার তিথি সবই লিখে রাখা ভাল। দেখছি তো—কত পদকর্তা ও বিষয়ে অবহিত না হওয়ায়, কালের ইতিহাস রক্ষিত হওয়া দুরূহ হয়। হারিয়ে যায় নামধাম, হারিয়ে যায় কালের হিসাব। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য তো যথাসাধ্য গুছিয়ে রেখে যাওয়াই উচিত।

পুঁথিগুলি চিরকাল থাকবে, চিরকাল আদৃত হবে এই ভেবেই এতো আকুলতা দেবনারায়ণ মল্লিকের।

জলযোগের পর আবার লিখতে বসে শুক্লশিব। লেখে প্রায় দ্বিপ্রহর অবধি। এ সময় পর্য্যন্ত আর কেউ কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না। পেটাঘড়িতে প্রহরের সঙ্কেত শোনা যায়। তখন তাড়াতাড়ি পুঁথিপত্র গুছিয়ে তুলে ফেলে দ্রুত গৃহে ফেরে।

'গৃহ'ই। মুকুন্দ সরকারের আন্তরিকতা, সহজভঙ্গী, আর বিশ্বাস, এ বাটিকে নিজ গৃহতুল্য করে তুলেছে শুক্লশিবের কাছে।

ফিরে এসে আর একদফা স্নান সেরেই অন্ন পাক করে নেয়। ব্যঞ্জনের দিক দিয়ে যায় না সে, একপাকে যা হয় সব কিছুই গোছানো থাকে।

একটি লেপাপোছা ছোট ঘরে শুক্লশিবের রান্নার ব্যবস্থা। এ ঘরটি পূর্বে বিন্দুবাসিনীর বাড়তি বাসন রাখার জন্য ব্যবহার হতো, সেটিই খালি করিয়ে ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। কোণের দিকে কিছুটা গর্ত খুঁড়ে পাতা হয়েছে উনুন, তার পাশে সংরক্ষিত থাকে জ্বালানীর কাঠ, শোলাকাঠি চকমকি পাথর। অপর কোণে ঝকঝকে মাজা পিতলের ঘড়ায় গঙ্গাজল, ঝকঝকে মাজা পিতলের বোগ্‌নো। সঙ্গে হাতা খুন্তি বেড়ি। একটি জলচৌকীর উপর পরিস্কার পাত্রে পাত্রে সাজানো থাকে

তেল লবণ খাঁটি গব্যঘৃত, বাটা মটর ডাল, কুমড়ো কাঁচকলা মানকচু ঝিঙে, ইত্যাদি যা যা সিদ্ধ করে খাওয়া চলে।

বিন্দুবাসিনী আপশোসে সারা হন। উঠোনে এমন কচি কচি লাউ শাক, ডাঁটাপাতা, বাগানে ডুমুর সজনে খাড়া, থোড় মোচা কাঁকুড় পাকা শশা, কিছুই ব্রাহ্মণের ভোগে লাগছে না। শুক্লশিব রান্নায় নারাজ। ভাতসিদ্ধটুকু মাত্র করে নেবে সে।

দুধজ্বালে বা দইপাতায় তো স্পর্শদোষ লাগে না, তা ছাড়া সব কিছুই গঙ্গাজলে। অন্নভোগের পাথরের থালা গেলাসের কাছে ঢাকা দেওয়া থাকে ঘরে পাতা দই। ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধ। আবার একধারে কয়েকটি গাছ থেকে সদ্যপাড়া কাঁচালঙ্কা ও পাতিলেবু। এবং দই দুধের সঙ্গে লাগতে পাবে বলে কিছুটা ইক্ষু গুড।

এর উপর আবার ব্যঞ্জন !

শুক্লশিবের কাছে এ আহার তো সমারোহময় 'ভোজ'। তথাপি বিন্দুবাসিনী ঘোমটা কিছুটা নামিয়ে কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে আক্ষেপ করেন, নিত্যদিন হবিষ্যির খাওয়া।—বেম্ন্ন নইলে মুকের আড় ছাড়ে? আর বাউনের যে মাচ্ খেতে নাই তা তো না। গুরু পুরুতের হেন্‌শেলও তো মাচ উঠচে। তোমার এই কাঁচা বয়েস, নিরিমিষ্যি খেয়ে খেয়ে শরীল বেমজবুত হয়ে যাবে না? চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাবে না? তায় আবার নেকাপড়ার কাজ।

এক সঙ্গেই যে বলেন, তা নয়। দফায় দফায় যেদিন সেদিন বলেন।

মুকুন্দও বলেন, মাছ খেতে আপত্তি কী? পুকুরে অ্যাতো মাছ। ব্রাহ্মণের ভোগে লাগে না। পাকা রুইয়ের খামি পাক করে নিতে কতোক্ষণ?

শুক্লশিব একেবারে উড়িয়ে দেয় ওকথা।

এরা সম্পন্ন গৃহস্থ, মা লক্ষ্মী উথলে ওঠা সংসার। এদের পক্ষে এ আক্ষেপ বাহুল্য নয়, কিন্তু শুক্লশিবের পক্ষে এ যে অতি বাহুল্য।

এতোগুলো দিন পার হয়ে গেল, তবু যেন আপন এই অবস্থাটাকে স্বপ্ন বলে মনে হয়। যেন হালকা ঘুমের সুখস্বপ্ন।

জ্ঞানাবধি দেখেছে সে অবহেলিত।

যেন তার জন্য দুবেলা দু মুঠো ভাতও বাহুল্য। একদিন দত্ত ঠানদি তার জ্যাঠা জ্যেঠিকে বলেছিল, ওকে অতই বা হ্যানস্তা কর কেন গা? ওর বাপের দরুণ ধান পানে ওর ভাগ নাই?

শুনে জ্যাঠা অগ্নিমূর্তি হয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, না, এক কাণাকড়াও ভাগ নাই। সব ওই হতভাগার বাপের রোগে, আর মা বাপের ছেরাদ্দয় খরচা হয়ে গেছে। মা যে আবার 'সতী' হতে গেলেন। সহমরণে মরা সতীর ছেরাদ্দ কি চাটটিখানি কথা?

তদবধিই জেনে এসেছে শুক্লশিব, এ পৃথিবীতে সে চির অনধিকারী, চির নিঃস্ব। এই যে লেখাপড়া শেখা, সেওতো নিজ চেষ্টায়। পাঠশালের একধারে গিয়ে বসে থেকে থেকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে যখন ঘুরেছে, সে তো দিন গেছে অর্ধাশনে অনশনে। নেহাৎ গলার পৈতেগাছাটা, আর সুকান্তি চেহারা এবং স্বল্প বয়েস, এই তিনটি পদাতিক সৈন্য তাকে অনশনের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে।

নাটোরের রাজবাড়িতে যে দিনগুলি কাটিয়েছে সে দিনগুলিতে অন্নকষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু সেও ওই হৃদয় স্পর্শরহিত অতিথিশালার ব্যবস্থা। ভৃত্যজন ব্যতীত কারো মুখই দেখতে পাওয়া যেত না।

আর এখানে?

স্বর্গ জায়গাটা কেমন জানা নেই শুক্লশিবের, এইটুকুই শুধু জানা আছে মৃত্যুর পরে সেই পরমধামে আশ্রয় মেলে। যেখানে শুধু আনন্দ, শুধু সুখ। শুক্লশিব যদি হঠাৎ দেখে সে স্বশরীরেই সেই স্বর্গে এসে হাজির হয়েছে, সেটাকে স্বপ্ন বলে ভ্রম করবে না?

কিন্তু শুধুই কি এই অবস্থাটাকেই স্বপ্ন বলে মনে হয়?

আর একটা শরীরিণী স্বপ্নের আবেশ ঘিরে থাকে না শুক্লশিবকে? একটি অনুপস্থিত উপস্থিতি তার সমগ্র চেতনাকে এক ছায়াময় অলৌকিক জগতের মধ্যে তলিয়ে রাখে না?

কে গুছিয়ে রাখে এমন করে? প্রতিদিন নির্ভুল নিয়মে?

নিজেকে আড়ালে রেখেও এমনভাবে আত্মপ্রকাশ! এই আত্ম-প্রকাশের মধ্যে কি শুধুই ব্রাহ্মণ সেবার পুণ্য সঞ্চয়েব চেষ্টা? না এ আত্মপ্রকাশে ধরা পড়ে একটি অনির্বচনীয় হৃদয় রহস্যেব দ্যুতি।

হৃদয়! হৃদয়ের স্পর্শ না থাকলে কি এমন কবে হৃদয়কে নাড়া দেয়? এমন করে সমস্ত সত্তাকে উদ্বেল করে তোলে?

শুক্লশিব সারা সকালই অনুপস্থিত থাকে, তবু অনুভব করতে পাবে তার জন্য এই নির্ভুল নিখুঁৎ গোছটি কবে রাখে তুলসী। বিন্দুবাসিনীর ভ্রাতুষ্কন্যা তুলসীমঞ্জরী।

তুলসীকে প্রত্যক্ষ গোচরে মুখোমুখি না দেখলেও তুলসীব সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি যে অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে। এ সংসারের সব কাজে তুলসী। সব ব্যাপারে তুলসী।—সর্বদা বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে তুলসী। তুলসী।

বিন্দুবাসিনী কোনো কালেই তেমন চৌকোস নয়। এখন আবার বুড়ো বয়েসে একটি শিশু দৌহিত্রকে পোষ্য নিয়ে রীতিমত অব্যবস্থিত। —মেজমেয়ের অনেকগুলি সন্তান, মানুষ করতে নাজেহাল হয় মেয়ে, তার মধ্যে আবার পুত্রের সংখ্যাই বেশী। ছটি ছেলেব মধ্যে সর্বকণিষ্ঠের উপরেরটিকে নিয়ে এসেছেন বিন্দুবাসিনী।

মেয়ে চায় বাবার স্বচ্ছল স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারে, এবং মায়ের আদরে যত্নে ছেলেটা মানুষ হোক, তার নিজেরও কিছু আসান হোক। কিন্তু একেবারে দানপত্র করে দিয়ে দিতে ইচ্ছে নেই তার। হলেও বা ছটা। ছেলে বলে কথা। মায়ের শূন্য প্রাণে একটু সুধার প্রলেপ হিসেবে

ছলেকে তার দিদিমার কাছে রাখা যায়। কিন্তু একেবারে দিয়ে দেওয়া ? ও বাবা !

অথচ, বিন্দুবাসিনী সেইভাবেই নিতে চান। একেবারে বিধিসম্মত ভাবে দত্তক নিতে।

মুকুন্দ অবশ্য এতে তেমন উৎসাহী নয়। বলেন, কাছে রাখছ রাখ না। ওরা তো সানন্দেই দিয়ে রেখেছে। আবার হোম যজ্ঞি করে পুষ্যি নেবার কী দরকার ? তাতে তোমার কী চারখানা হাত গজাবে ? কথায় আছে জন জামাই ভাগনা তিন হয়না আপনা। জামাইয়ের বেটাই কি আপন হবে ?

হলে কি হবে ? চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

বিন্দুবাসিনীর ঝোঁক, নিজের করে নেওয়া। যাতে দু' দিন নিজের মায়ের কাছে গেলে, কেঁদেকেটে বায়না ধরে। বিন্দুবাসিনীর কাছে চলে আসতে চাইবে। বিন্দুবাসিনীকে 'মা' বলে ডাকবে, এবং সেই মাতে স্নেহহারা হবে।—তিনটেই মেয়ে সন্তান, জন্ম থেকেই মনের মধ্যে বিসর্জনের সুর। পরগোত্তর করে দিতে হবে।—বড়জোর সাতটা আটটা কি মেরে কেটে ন-টা বছর, তার পরই তো বিদায় দান। আর তার ওপর কানাকড়ির জোর থাকবে না। 'মা' বলে ডাকতে কবার আসবে ?

আসবে যদি তো নিজের দরকারে।

আঁতুড় তোলাতে।

তার মানেই ভাবনা চিন্তা, খাটা খাটুনী, এঁড়ে ছেলে সামলানো, কিন্তু ওই তিনটে ছটা মাস গেল তো ব্যস। অমনি শ্বশুরবাড়ির টনক নড়ল, তলব এলো নিয়ে যাবার জন্যে।

কিন্তু ছেলে ? ছেলের স্বাদ আলাদা।

ছেলের বদলে বিন্দুবাসিনী নিজেই তলব পাঠাবার অধিকারিণী হবেন।—তবে ? শুধু জামাইয়ের ছেলেকে 'মানুষ' করে দিতে কী দায়? সে ছেলে কি বড় হয়ে বিন্দুবাসিনী মরলে 'দশ দিন' অশৌচ

নেবে ? না 'কাচা' গলায় দেবে ? তেরাত্তিরের শেষে নোখ কেটে নেয়ে আপদ চুকিয়ে একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্‌গ্যু করে দিদিমার ঋণ শুধে দেবে ব্যস !

বিন্দুবাসিনী অতএব একটি জটিল পথ ধরেছেন। 'সোনাব গৌরাঙ্গ'কে সর্বদা নিজের কোলে কোলে, যাকে বলে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজের সঙ্গে লেপটে রেখে মানুষ করছেন। দাসদাসীর কাছে যেতে দেন না একবারও, তুলসীকে তো ছুঁতেই দেন না। বিশেষ একটি ভয় আছে—তুলসীকে পেলে বোধ হয় আর বিন্দুবাসিনীকে পুঁছবে না। কেন এই ভয় তা ভগবান জানেন। কাজেই তুলসী যদি কৃপা পরবশ হয়ে বলে পিসিমা, তুমি আব কত বইবে ? ছুপুববেলা আমাব কাছে খানিক বেখে ঘুমিয়ে নাও না।

বিন্দুবাসিনী 'না না' করে ওঠেন।

বওয়া আবার কি ? একটা তুধের বাছা। এ কি দশমনীবোঝা।

কাজেই সংসারের সব তদাবকী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন তুলসীব উপর। ছেড়ে দিয়েছেন অতিথির সব দায় দায়িত্ব। বিন্দুবাসিনী শুধু সোনার গৌরাঙ্গকে কোলে নিয়ে—এসে দাঁড়িয়ে ওই আপশোস বাক্যগুলি উচ্চাবণ করেন। আর মাঝে মাঝেই এধারে এসে খোঁজ নেন তুলসী, টাটকা ঘি থেকে দিয়েছিস তো ? তুলসী, শিবু ঠাকুরের জন্যে মুংলীর তুধটা আওটেছিস তো ?

শুক্লশিব বাহ্যত স্থির ধীর আত্মস্থ, কিন্তু এই সব সময় তো শুধু কানটাকেই উৎকর্ণ করে রাখে তা নয়, উৎকর্ণ করে রাখে সমস্ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে, সমগ্র সত্তাকে।—

উত্তর শোনা যায়। খুব যে মৃত্যু তা'ও নয়, তুলসী তো বাড়ির বৌ নয়। বাড়ির মেয়েও নয়। গিন্নীর এক ঘাড়েপড়া ভাইঝি। তা ছাড়া পিসির মতো লজ্জাশীলা বলেও খ্যাতি নেই তার। পিসির অনুমতি পেলে, অনায়াসেই ওই বামুণের সঙ্গে আড্‌ডা জমাতো সে।

ওই উত্তরের স্বর শুক্লশিবকে কেমন যেন উতলা করে তোলে।

একবার কথা কয়ে বলে উঠতে ইচ্ছা হয়, এতো যত্ন করতে শিখলে কী করে তুমি? এমন প্রাণমন দিয়ে? আর শিখলেই যদি তো যেখানে মেয়েমানুষের যথার্থ ঠাঁই সেখানে ঠাঁই পেলে না কেন।

মুকুন্দর কাছ থেকে কথায় কথায় তুলসীর পরিচয় জ্ঞাত হয়েছে শুক্লশিব। বিধবা নয়, পতিপরিত্যক্তা নয়। দু দুটো সতীনের সঙ্গে ঘর করতে নারাজ বলেই পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে। মা বাপ নেই, তাই পিসি পিসের আশ্রয়ে।

মা বাপ নেই, এই শব্দটাই আরো আলোড়িত করেছে শুক্লশিবকে। আর ওই পালিয়ে আসা মেয়েটার সঙ্গে যেন একাত্মতা বোধ করেছে, ঠিক শুক্লশিবের মতই।

এই কথাটাও বলতে ইচ্ছে করে ওকে। তুমি ত মানুষের দুর্ব্যবহারে দুঃখে ঘৃণায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছ, আমিও তাই তুলসী। মনে মনে তুলসী বলেই সম্বোধন করে শুক্লশিব। শুনেছে সে সপ্তদশ বর্ষীয়া। অতএব শুক্লশিব তার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ।—

তা ছাড়া সর্বদা মুকুন্দ আর বিন্দুবাসিনীর কণ্ঠে হতে ওই নামটি উচ্চারিত হতে শোনে। দাসদাসীরাও বলে তুলসীদিদি।—এমন কি ছোট্ট ছেলেটাও বিন্দুবাসিনীর কোল থেকে ডাক দেয়, তুলৃথি, অ্যাই তুলথি কোতায় তুই?

শুক্লশিবও মনে মনে ডাক দেয় তুলসী, তুলসী, কোথায় তুমি একবার এসে সামনে দাঁড়াতে পার না? তোমায় একটু কৃতজ্ঞতা জানাই। আর তোমার সঙ্গে যে আমার একাত্মতা, সেই খবরটুকু জানাই।

তা একান্ত প্রার্থনা বুঝি সত্যিই কোথাও গিয়ে পোঁছয়।—সহসা একদিন তুচ্ছ কারণেই ঘটে গেল সেই হৃদয় উদ্বেলকারী ঘটনাটা।—শুক্লশিব অবশ্য ভাবল যা কিছু আবেগ অনুভূতি, শুধু তারই। কিন্তু দিনে দিনে তিলে তিলে কখন মধুচক্র উঠেছে ভরে, কে কার সন্ধান রাখে।

হঠাৎই একদিন বিন্দুবাসিনী শুক্লর খাওয়া তদারক করতে করতে বলে উঠলেন, ঘরে অ্যাতো আমসত্ত্ব, শিবুঠাকুরকে দুধভাতে একটু দিস না ক্যানোরে তুলসী ? দে 'যা তো' একটু।

তাঁর কোলে নাতি। এবং আপাতত তিনি আচার আমসত্ত্বর ঘরে ঢোকবার মত বিশুদ্ধবাসা নয়, তাই অর্ডারটাই দিতে পারেন শুধু। বলেন সাঙার ওপর 'তোলা' হাঁড়িতে যে মিষ্টি আমসত্ত্ব থুয়েছিলি, সেই থেকে আন।

কাজেই তুলসীকে চলে আসতে হয় এ ঘরের দরজায়।

ঘরের মধ্যে তো ঢুকবে না, তাই একটি ছোট পাথরের রেকাবে করে খানিকটা আমসত্ত্ব দিয়ে দরজার বাইরে থেকে ঈষৎ ঠেলে দেয় পাতের দিকে।

শুক্লশিব তখন বোগ্‌নো থেকে ভাত নিয়ে পাথরে ঢালছে।—

আমসত্ত্বটা রেকাব সমেত ছুটে যেতেই সে হাঁ হাঁ করে ওঠে, এতো কেন ? এতো কী হবে ? একটু তুলে রাখো।

গ্রামের ছেলে। বয়েসে একটু ছোট মেয়েছেলেকে 'আপনি' করে কথা বলতে জানে না। তাই যা জানে তাই বলে।

বিন্দুবাসিনী বলে ওঠেন, ও আর বেশী কি বাবা ? ঘরে কতো সামগ্রী। কে খায়।—তোকেও বলি তুলসী, পিসি না বললে দিতে নাই, ঘরে কতো আচার, এতো আমসত্ত্ব একটু হুঁস হয় না ? মানুষজনকে একটু যতনো কর্ত্তে শিকতে হয়রে তুলসী !

শুক্লশিব চমকে ওঠে।

কাকে কী অপবাদ ! তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সে কি, সে কি, উনি তো খুবই যত্ন—

ছাই।—হুঁশ থাকলে তো। শিবুকে এতো লজ্জা করারই বা কি আছে তুলসী ? শিবু ঘরের ছেলের মতোন। এটা ন্যাও, ওটা ন্যাও না করলে ? উনি কি চেয়ে নেবে ?

শুক্লশিব বলে ওঠে চেয়ে নেবার মত অবস্থা কোথায় ? এতো বেশী বেশী থাকে।

তোমার যে বাবা পাকির আহার। মাচ না ডাল না বেন্নুন না, এ আবার খাওয়া। এই যে আমায় দশ দিনের জন্যে শান্তিপুর যেতে হচ্ছে, কে দেকবে ? তুলসী তোকে এই বলে রাকচি—

শুক্লশিব থতমত খেয়ে বলে, আপনি শান্তিপুর যাবেন ?

তবে আর বলচি কি ? বড় মেয়ের মেগের বে! মেয়ের শাউড়ি নাই, করণ কারণ সব আমাকেই দেকতে হবে --তুলসী 'আর তুলসীর পিসে বের দিনকে যাবে। এনার তো কোতায় নড়বার জো নাই। ওই একটা দিন।

বিন্দুবাসিনী প্রথম দিকে ফিসফিসে গলায় শুরু করেন, তারপর আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারেই স্বাভাবিকে ওঠেন।. তবে ঘোমটাটি ঠিক থাকে।

॥ চার ॥

সেই ছাড়পত্র।

সেই বাঁধেব মুখেব আল সবিযে নেওয়া।

দশটা দিন তো কমও নয়।

নাতিকে নিযেই বওনা দিলেন বিন্দুবাসিনী।—সেখানে সেজমেয়েও তো আসবে। সেখানেই পরীক্ষা। 'গোরা' যদি আপন মাকে চিনতে না পারে, যদি দিদিমাকে আঁকড়ায়, তবেই না, বিন্দুবাসিনীর এতোদিনেব সাধনাব সিদ্ধি।

আর পরীক্ষাটা হবে দশজনেব সামনে।

বিন্দুবাসিনী তাই মহোৎসাহে যাত্রাব আয়োজন কবে তুলসীকে তালিম দিয়ে যাত্রা করেন।

মনে ভাবেন তুলসীটা যে সতীন জ্বালা সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছে, সেটা বিন্দুবাসিনীব পক্ষে মস্ত একটা লাভ। ও না থাকলে সমগ্র সংসারটি ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতেন কী কবে?

মুকুন্দ এতে একটু অস্বস্তি অনুভব করেন। বাব বার বলেন, তুলসী মা, তুই যাই আছিস, তাই তোর পিসির সংসারটা তরে গেল। এই সময় যতো ধান চাল রাখা তোলা। মুনিষদের ভাত জল, ছা চিমড়িগুলার জল পানের ব্যবস্থা—

তুলসী গাঢ় গলায় বলে, পিসেমশার উল্টো ব্যাখ্যা। পিসির সংসারটা ছেলো বলেই তুলসী মুকপুড়ী তরে গেল।

মুখপুড়ী !

মুকুন্দ ওই লাবণ্যময়ী সন্ত যুবতী মেয়েটার আলো ঝলমলে মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলেন, ও কথা বলতে নাই মা। রাজলক্ষ্মীর মত চেহারা তোর। ভগবান কপালে দুঃখ লিখেছেন।

পাড়াপড়শী এবং বিন্দুবাসিনীর পিতৃকুলেব জ্ঞাতিবা অবশ্য অন্য কথা বলে। মেয়ে 'অসন্তো' ধিঙ্গী নাচুনী। সতীন কাঁটা আবার কটা মেয়ের না থাকে। 'সন্তো শক্তি নে' থাকতে হবে। তা' তো না পিসির ঘরে ভাত আচে, আয়েস আচে, সেখানে গে গেঁড়ে বোস থাকবো। পিসিরও উসকুনি আছে। অমন একখানা ডাণ্ডা খাণ্ডা মেয়ে সোংসারে এসে জুটলে সুক কতো।—বিদবা না, যে তাব জন্যে আলাদা হেঁসেল কাড়তে হবে। ভাতহাঁড়ির ভাত খাবে, পাতের নাতেরও খাবে।—

তা' কথাগুলো একেবাবে মিথ্যে নয়।

পিসি বলেছিল বৈকি! অতো জ্বালা সইবি ক্যানো? মা বাপ নাই, আমি তো আচি। আমার যদি দু মুঠো জোটে তো তোবও জুটবে। না জোটে পিসি ভাইঝি এক থালা ভাত ভাগ করে খাবো।

কথাগুলো অবশ্য বাহুল্য। তবে বলতে হলে তো ওই ভাবেই বলতে হয়।

বৃহৎ একথালা ভাতেব সঙ্গে এক কাঁসি মাছ চচ্চড়ি নিয়ে বসেন বিন্দুবাসিনী, খানচাবেক ল্যাজার সর্ষে ঝাল। আর বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, তোকে পুষতে আমার খরচটা কী তুলসী? এই অ্যাকজনেব ভাত বেন্নুনে পিসি ভাইঝি দুয়ের হয়ে যাচ্চে।

হয়তো পড়শীদের কানে তুলতে, হয়তো বা ভাইঝির সম্মান রক্ষার্থে, হয়তো বা নিজের মনকেই পৃষ্ঠবল জোগাতে।—

মুকুন্দ কিন্তু সত্যিই তুলসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

তুলসী এসে পর্যন্ত সংসারে যেন লক্ষ্মীশ্রী ঝলসাছে।—যেদিকে জল পড়ে, তুলসী সেদিকে ছাতা ধরে।—কাজের ব্যবস্থা কত ওইটুকু মেয়ের।

অবশ্য সতেরো আঠারো বছরের মেয়েকে 'ওইটুকু' বললে লোকে গায়ে ধুলো দেবে। তবু মনে মনে কী না বলা যায়।

বিন্দুবাসিনী চলে যেতে নতুন করে শ্যালক কন্যার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন মুকুন্দ।—মুখচোরা ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তুলসীর সদা সজাগ দৃষ্টি না থাকলে কী উপায় থাকতো।

আর তুলসী?

তুলসী তো এখন বাঁধভাঙা নদী।

আর বাঁধভাঙা নদীর যা আচরণ, তারও তাই হবে না তো কী হবে?

তুলসী সক্কালবেলাই ছোলা গুড়ের সঙ্গে একজোড়া খাশামোয়া ধরে দিয়ে বলে, পিসি আমায় তোমায় যত্ন করতে বলে গেচে, মনে রেখো। না খেলে মাতার দিব্য!

প্রথম দু একটা দিন শুক্ল চমকে গিয়েছিল। থতমত খেয়েছিল, অতঃপর যা হয়। বয়েস বয়েসকে টানে। ক্ষুধিত হৃদয় ক্ষুধিত হৃদয়কে টানে।

কিন্তু এই আকর্ষণের মধ্যে কি মালিন্য আছে?

অপবিত্রতার খাদ আছে?

অশুভের হাতছানি আছে?

না, সে কথা বলা চলবে না।

শুক্লর শিক্ষা দীক্ষা আলাদা। আত্মহারা হয়ে গর্হিত কিছু করে বসবার কথা ভাবতেই পারে না সে।—শুধু অনির্বচনীয় এক আনন্দের স্বাদে মন টনটন করতে থাকে তার।—দিন রাত্রির সমস্ত মুহূর্তগুলো যেন জীবনের যথার্থ অর্থ বহন করে আনে, আকাশে বাতাসে, বিশ্বচরাচরে কী এক অনাস্বাদিত সঙ্গীত ধ্বনি।

অপর পক্ষ?

সেও তো এতোদিন অন্তরালে থেকেও অকারণ পুলকে ভেসেছে। বুঝতে পারত না। হঠাৎ পৃথিবীটাকে এতো ভাল লাগছে কেন? কেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হতো, কোথায় যেন কী একটা পরমপ্রাপ্তির আশ্বাস বহন করে এনেছে এই সকাল।—রাত্রে শুয়ে পড়ার পর মনে হতো আর একটা সকাল আসছে তার জন্যে। নীরব আকুলতার মন্ত্রে ছন্দিত হতো তার দেহ মন। বন্দনা গান রচিত হতো হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।—কিন্তু এতো সব ভাষা কি জানা ছিল তুলসীমঞ্জরী নামের নিরক্ষর মেয়েটার?

ভাষা জানা ছিল না।

কিন্তু তুলসীর বিধাতা তুলসীকে অনুভূতি দিতে কার্পণ্য করেন নি। হৃদয় আছে তার, সে হৃদয় অনুভূতিতে মর্মর।

এখন তুলসীর অহরহ অন্তরে ধ্বনিত বাসনাব্যাকুল ভাষাটা শব্দময় হয়ে উঠে বাঁচে। তুলসী কলঝঙ্কারে বলে ওঠে, পুঁথি নিকতে নিকতে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে থেকো না শিবঠাকুর। দুটো অন্নপক্ক করতেই রোদ আকাশের মাথায় ওঠে। তোমার মিটলে তবে তুলসীর খাওয়া তা যেন মনে থাকে।

বরাবর মুকুন্দ সকাল সকাল খেয়ে সেরেস্তায় চলে যান, বেলা গড়ায় বিন্দুবাসিনীদের দাসী চাকরদের। তবে জগন্নাথ নকুড়, মানদা বুড়ি ওদের ভাত রাঁধে কেষ্টর মা। গরিব মেয়েটা উঞ্ছবৃত্তি করে সংসার চালায়। পাঁচজনের ঘরে মুড়ি ভেজে, ডাল ভেজে ও জাঁতায় ডাল ভেঙে, বড়ি দিয়ে আচার আমসত্ত্ব বানিয়ে দিয়ে যা মজুরী জোটে তাতেই সঙ্কুলান করে নেয়। বিন্দুবাসিনী ওকে এই কাজে নিয়োগ করে নিজের খাটুনী কমিয়েছেন তারও একবেলার ভাতের সুসার করে দিয়েছেন।

চাষের সময় মুনিষদের ভাত রাঁধার ভারও নেয় কেষ্টর মা। আর নিজে বাড়ি যাবার সময় বড় গামলায় এক গামলা ভাত, জামবাটি ভর্তি

ডাল, কাঁসিভর্তি চচ্চড়ি নিয়ে যায় ছেলেপুলের জন্যে। হলেও মোটা আকাঁড়া চালের ভাত, মাষকলাইয়ের ডাল আর মাছের কাঁটা চোকরা দেওয়া ডাঁটা পাতার চচ্চড়ি তাতেই সে কৃতার্থ।

কৃতার্থ তুলসীও।

এই ব্যবস্থা হওয়া অবধি সারা দুপুর তাকে রান্নাঘরে ঝলসাতে হয় না। তুলসীর ভাগে এখন আপাতত পিসে আর সে। তুলসীর তাই অগাধ অবসর। তুলসী তাই গায়ে দেবার মতো বড একখানা কাঁথা ধরেছে। পূজো বাদেই তো শীত এসে যাবে, কাঁথাখানা তার আগে হয়ে যাওয়া দরকার।

পিসির অনুপস্থিতিতে 'সময়' যেন আরো বেড়ে গেছে। একশো রকম কথার উত্তর দেবার দায় তো নেই।

তুলসী শুক্রুর রান্নার জোগাড়টি নিখুঁৎ করে সেরে রেখে কাঁথাখানা নিয়ে দাওয়ায় বসে। লাল কালো হলদে নানান রঙা সুতো। যোগীন তাঁতির ঘর থেকে কিনে এনেছে। সুতো যোগীন সহজে কাউকে বেচে না। কিন্তু তুলসীর আবেদনের আলাদা মূল্য। তুলসী সরকার মশাইয়ের বাড়ির লোক। আর দাম তো দশ বিশ কড়ি নয়, ধামাভর্তি সিধে সাজিয়ে ধরে দেয়। আবার দয়া ভিক্ষার মতো মিনতি জানায় 'হেই যোগীন দাদা, কাচা সুতোটি যেন দিও না। জলে ডোবালে যেন ছোপ না ধরে।'

যোগীন তাঁতি বেছে ভাল সুতোই দেয়।

শুক্রু এসে বাড়ি ঢুকলে হাতের কাজ থামায় বটে তুলসী কিন্তু যখন সে রান্নায় এসে বসে, তুলসীর হাতও চলে মুখও চলে। পিসির আক্কেলটা দেখছ ঠাকুর? দশ দিন বলে বিশ দিন করছে।

শুক্রু মৃদু হেসে বলে, তাতে তো তোমার কিছু দুঃখ দেখছি না। বেশ তো আছো।

তো, বেশ থাকবো না তো কি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবো? ন্যাও চক্‌মকিটা ঠোকো—

হচ্ছে, তাড়া কী ?

শোনো কথা ? বেলা গড়িয়ে যাচ্চে না ?—আচ্ছা ঠাকুর আমি যদি কুটনো বাটনা করে দিই, বেন্নুন রাঁদতে তোমার কষ্টটা কী ?

শুক্র হেসে বলে, সুখই বা কী ? আমার ওসব ইচ্ছেই করে না।

তুলসী বলে, ধন্যি বাবা। আমায় যদি কেউ বলে 'পাঁচদিন ভাতে ভাত খাব, আমি কাঁদতে বসবো।'

তোমার কথা আলাদা—

শুক্র বলে, ছেলেবেলা থেকে জেনেছি ভাতটা জুটলেই যথেষ্ট। ওর বেশী কখনো আশাই জন্মায়নি। এ তো রাজভোগ। আর তোমাদের এই যত্ন আদর।

হঠাৎ মুখটা অন্যদিকে ফেরায়। চোখের জলটাকে ঝরে যেতে দেয়।

তুলসী ছুঁচটা থামিয়ে বলে, খাওয়ার কষ্ট অবিশ্যি তেমন ছেল না। কখনো, তবু তুলসীও তোমার মত হাড়দুঃখী ঠাকুর।

কোনো দিন শ্বশুরবাড়ির কথা ওঠে।

হেসে হেসেই বলে, মেয়েমানুষ হয়ে তো জন্মাওনি ঠাকুর, বুঝিবে কী ? বেটাছেলের যতো দুঃখই থাক মেয়েমানুষের তুল্য নয়। ভাবো পঞ্চাশ ষাট বছরের বুড়ো বর, তবু তাঁর নতুন বৌ নিয়ে ঘর করবার সখ ! মা মরতে মামার ঘরে ছেলাম, মামাকে একমুঠো টাকা পণ দে, বুড়ো তো সখের মাতায় বে' করে বসলো। ওদিকে ডাকিনী যোগিনী দুই গিন্নী তার, নতুন বৌটাকে খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাকা দেয়, চুলের ঢাল কেটে কমিয়ে দেয়, বাড়া ভাতের ওপর ঘুঁটের ছাই ছড়িয়ে দ্যায়, আলতা সিঁদুর লুকিয়ে রাকে পরতে দেয় না, আর বুড়োর কাচে লাগাতে ভাঙাতে বসে, নতুন বৌ এই, নতুন বৌ তাই—বুড়োর শখের প্রাণ শুকিয়ে ধূনো।

আচ্ছা কেন ? ওরাও তো দুজনে সতীনই, একা তোমার ওপরই বা অ্যাতো রাগ কেন ?

তুলসী মুখ নীচু করে হাসে, বলে, বুঝছ না ? ওরা বুড়ি, আমি যুবি। আবার বলে, তো যেদিন নিন্দে মন্দ করতে করতে স্বভাব চরিত্তির

তুলেলো, সেদিন বললাম ধুত্তোর নিকুচি করেচে তোর শ্বশুর বাড়ি।—এরাই যদি বদনাম দেয়, তো চলে গিয়ে হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বদনাম কুড়োই।—ওকি ঠাকুর কাট যে জ্বলে যাচ্চে বোগনো চড়াও।

শুক্ল বলে, খোকার জন্যে এতো বড় কাঁথা?

তুলসী মুখ টিপে হাসে, কে বললে, খোকার জন্যে?

'গোরা'কে খোকাও বলা হয়।

তবে অত ফুল পাখি পাতা লতার বাহার?

কেন, 'খোকা' নইলে বাহারী কাঁথা গায়ে দিতে নাই? এ কাঁথা সিনোচ্চি আমার গুরুঠাকুরের জন্যে।

ও বাবা, তোমার আবার গুরু ঠাকুর আছে?

থাকবে না কেন? তুলসী মানুষ নয়?

আহা তা বলছি না—মানে এই বয়েসে—

বয়েসটা কি কম হল শিবঠাকুর। বলে কাঁথাখানা খুলে ধরে বিছিয়ে বলে, বলতো এই লাল পাখিটার পাশে হলদে ফুল মানান দেবে, না কালো ফুল।

শুক্ল হেসে বলে, ফুল কখনো কালো হয় না।

ওমা! এ কি সত্যি ফুল?

সত্যির মত তো? ভগবানের রাজ্যে তুমি কোনো কালো ফুল দেখেছ?

তালে হলদে দেবো?

তা দিতে পারো। আচ্ছা এতো নক্সা কোথায় পাও? ফুল, পাখি, মাছ, শাঁক ঘট, স্বস্তিক, কতো কি নক্সা কেটেছ?

তুলসী লজ্জিত হাসি হাসে। দেখে দেখে। তাঁলে ভাল হচ্চে তো।

নিশ্চয়। তোমার গুরুদেবের ভাগ্য ভাল। থাকেন কোথায় তিনি।

তুলসী হেসে বলে, এই কাচেই। ও কি! ও কি হচ্চে, ভাতের ফ্যান পড়ে যে উনুনের জ্বাল নিবে গেল।

তা যাক। সেদ্ধ হয়ে গেছে। উৎকৃষ্ট বাসমতী চাল! কাঁচাও খাওয়া চলে।

না বাপু আমি আর কতা কইবো না। একপাকে পাক, তাও যদি পুড়ে যায়—কি কাঁচা থাকে।

শুক্ল হঠাৎ সীমারেখার কিনারায় পা ফেলে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে খেলে, পোড়া ভাতও অমৃত লাগবে তুলসী।

তুলসী!

এই প্রথম নাম ধরে ডেকে উঠল শুক্ল। তুলসী কেঁপে উঠল।

তাড়াতাড়ি সেলাইপত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে উঠল কতায় কতায় ভুলে গেচি, কৎবেল মেকেছিলাম তোমার জন্যে, নিয়াসি।

কিন্তু এ তো তুলসীর সমুদ্রে বালির বাঁধ দেবার বৃথা চেষ্টা। বুকের মধ্যে যে অশান্ত সমুদ্রের দাপাদাপি। নিজের ভিতরকার এই চেহারাটা তুলসীকে ভুতের মত ভয় দেখালেও, দেখতে তো পায়। ঢেউ ওঠে উত্তাল হয়ে, আর তখন তুলসী ওই শান্ত সৌম্য স্থির ব্রাহ্মণ কুমারের বহিরঙ্গের রূপটার সঙ্গে নিজের ভিতরের রূপটাকে মিলোতে বসে। তখনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। ওই শান্ত লোকটার উপর ভারী রাগ হয় তুলসীর তখন।

তুলসীর তখন নিজেকে হেরে যাওয়া হেরে যাওয়া মনে হয়। মনে হয় খুব ছোট। সংকল্প করে আমিও ওই রকম স্থির থাকবো। কী দরকার আমার, ওর কি দরকার না দরকার দেখতে যাবার? পিসি ভার দিয়ে গেছে, তাই একটু বেশী করে দেখা। পিসি হুকুম দিয়েছে বলেই কথা বলা। পিসি ফিরে এলে কি এতো দেখতে আসছি আমি?

সংকল্পটা তখনো পর্যন্ত থাকে, যখন শুক্লকে আহারের পর মুখশুদ্ধির হরিতকীর টুকরোগুলি সামনে এগিয়ে দিয়ে, নিজে খেতে চলে যায়।—কিন্তু খেতে খেতেই তো হঠাৎ মনে পড়ে যায়, 'ঠাকুরের' ঘরে হাত-পাখাখানা হাতের কাছে আছে তো ? দুদণ্ড সময় তো মাত্র একটু বিশ্রাম, আবার তো বেলা না পড়তেই বাবুদের বাড়ি ছুট দেবে পুঁথিপত্তরের কাজে।—তা বিশ্রামের সামান্য সময়টুকু যদি মশা মাছি বা গরমের উৎপাতে উৎখাত হতে হয়, তো তুলসীর লজ্জার শেষ থাকবে ?

সেই লজ্জা নিবারণের উদ্দেশ্যেই তুলসী তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নিয়ে একখানা পাখা হাতে করে এদিকে চলে আসে।—লম্বা দালান পার হয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে দু সিঁড়ি নেমে উঠোনে পড়ে, পাশের দিকে আর দু' তিনটে সিঁড়ি উঠে ওই 'অতিথিঘর' খানা।—দরজার ধারে এসে দাঁড়ায়।

দেয়ালের ধারে চৌকী, ঘরে না ঢুকলে দেখতে পাওয়া যায় না মানুষটা শুয়ে আছে, না বসে আছে, না কি আবার কোনো 'গ্রন্থ' পাঠ করছে।—শোবার চৌকীর মাথার কাছে বড় কুলুঙ্গীর মধ্যে বেশ কিছু পুঁথি গ্রন্থ তো রাখা থাকে, লাল গেরোর কাপড়ে মোড়া। আর ওই পড়া পাগল বামুন তো যখনি সময় পায় সেইগুলি খুলে বসে।—

রাত্রে এদিকে আসা হয় না, আহারাদির পর ভিতর দালানের দরজায় তালা লাগিয়ে রাখেন মুকুন্দ সরকার। মজবুত তালা, লোহার হুড়কো। ভিতরবাড়ি বারবাড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন। মাঝে মাঝে গ্রামে ডাকাতির খবর পাওয়া যায়, পরবর্তী কিছুদিন আবার সাবধানতার ঘটা বাড়ে পল্লীতে।

সদর অন্দর বিচ্ছিন্ন তবু তুলসী টের পায় শিবঠাকুর ঘুমোয়নি, জেগে বসে পুঁথি পাঠ করছে।—খোলা জানলা দিয়ে প্রদীপের মৃদু শিখার আলোর আভাস এসে উঠোনে পড়ে। যতক্ষণ না ওই আলোটা নেভে, তুলসীও ঘুমোতে পারে না। কারণে অকারণে সিঁড়ির ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ায়। দোতলায় ঘর নেই, ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে।

অতএব সিঁড়ির ঘরও আছে। সেই নীচু ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে ঘরটায় তুলসীর যত রাজ্যের দরকারি জিনিস—যে সব জিনিস রাতের দিকে দরকার হয়। পানের বাটা, হাতপাখা হঠাৎ গায়ে দেবার এক আধটা চাদর, এসব ছাড়া খাবার জলের কলসীর সারি। এ ঘরে জল খুব ঠাণ্ডা হয়। আর জল যত ঠাণ্ডা হয়, ততই তো ভাল। খেতে সুস্বাদ, খেয়ে হজম।

তা' তুলসীর আবার রাতের দিকেই বারে বারে জলের পিপাসা জাগে। তবে? কী করবে বারে বারে এ ঘরে না এসে?

আলোর ওই ক্ষীণ আভাসটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তুলসী অনুচ্চারিত উচ্চারণে বলে রাত্তির জেগে জেগে তুমি একটা ব্যামো না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি ঠাকুর। উদয়াস্তো এতো কি পড়া তোমার? এই বয়েসেই তো তুমি অনেক বিদ্যে করে ফেলেছ। পিসে তো তাই বলে। তবে?

আরো কত কীই বলে। অনুপস্থিতের উদ্দেশ্য।

অথচ আবার যখন পিলসুজটি মেজে চকচকে করে প্রদীপ সাজিয়ে রাখে, তখন প্রদীপের খোলভর্তি করে তেল ঢেলেও হাতের কাছে ছোট চুমকি ঘটিতে ভরে রাখে এক ঘটি তেল। তার সঙ্গে মজুৎ রাখে গোছা খানেক সলতে। চক্‌মকি পাথর, শোলা কাঠি।

পিসের নিজের ক্ষেতের রেড়ির তেলের অভাব নেই ঘরে। আর ওই খুঁটিনাটি কাজগুলো তো তুলসীরই করণীয়। সকল ঘরের প্রদীপই সাজিয়ে রাখে তুলসী। কে দেখতে যায় কোন ঘরে তুলসী তার হৃদয় খানিও সাজিয়ে রেখে আসে?

সে সেই সাজানো হৃদয়ের ছবিটি দেখতে পায় সে কিছুক্ষণ পাঠ রেখে অভিভুত চিত্তে বসে থাকে।

তরুণ হৃদয়ের অভিভূত ব্যাকুলতাকে আয়ত্তে আনতে সময় লাগে। আবার মনে হয়, এটা ঠিক নয়, কোথায় যেন একটা চোরা গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে, কখন বুঝি কোথায় তলিয়ে যেতে হবে।—

একদা প্রদীপের অভাবে, সন্ধ্যার পর আর অধ্যয়নের উপায় ছিল না। মাত্র পূর্ণিমার কাছাকাছি কয়েকটা রাত ছিল হাতে। জ্যোৎস্নার অকৃপণ দান প্রদীপের অভাব মিটাতো এখানে এই অকৃপণ হৃদয়ের দানে শুধু সন্ধ্যা রাত্রি নয় জীবনটাই আলোকিত।

এই মুকুন্দ সরকারকে প্রথম দর্শনে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছিল শুক্ল। এখন ভাবলে নিজের কাছেই নিজের লজ্জায় মাথাকাটা যায়। এ এক অদ্ভুত মানুষ। যথেষ্টই হৃদয়বান, স্নেহপ্রবণ শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু কোনো কিছুতেই আধিক্য নেই। নেই হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ। আবার রীতিমত বিষয়বুদ্ধি সম্পন্নও। শুক্লশিবকে নিয়ে আসতে পারলে আর আটকে ফেলতে পারলে যে মুকুন্দর মনিবের একটা মস্ত সমস্যার সমাধান হবে সেটি মনে রেখেই তিনি সেদিন শুক্লশিবকে অমন আগ্রহ ব্যস্ততায় টেনে এনেছিলেন।

তবে বিষয়বুদ্ধির ঊর্দ্ধে আর একটা নির্মল বুদ্ধি থাকে, যে বুদ্ধি 'মানুষ' সম্পর্কে একটা মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হয়। সেই বুদ্ধিই অনুভবের মধ্যে এনে দেয়, সব চাষাই 'চাষা' নয়, সব বামুনই 'বামুন নয়'।

দেবদুর্লভ রূপের অধিকারী এই ব্রাহ্মণ সন্তানকে বাড়ি নিয়ে এসে দেখলেন মুকুন্দ সরকার ছেলেটার গুণ তার রূপের মহিমাকেও ম্লান করে দিচ্ছে।

তদবধি মুকুন্দ সরকার নিশ্চিন্ত আনন্দে ভাসছেন।

বিন্দুবাসিনী বিগলিত।

শুক্ল কি তাঁদেব ওই সশ্রদ্ধ স্নেহে বিগলিত, আহ্লাদে ভাসা মূর্তিটা দেখতে পায় না? বুঝতে পারে না। এখানে তার আসন পাকা হয়ে গেছে। তবু কেন শুক্লর সর্বদাই মনের মধ্যে ভয়ের বাসা? কেন মনে হয়, এই সুখ এই নিশ্চিন্ততা এই অযাচিত অহেতুক ভালবাসা, যাতে শুক্ল অবিরত অবগাহন করছে, তা যেন 'নিশীথের সুখস্বপ্ন সম।' যেন বাতাসের মুখে জলের ফোঁটার মত। যে কোনো মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে

পারে। অথচ সেই ভয়ের সঙ্কেতেই কী গভীর আনন্দে ভরে থাকে মন। এ এক অনাস্বাদিত স্বাদ। তবু অনেক সময় রাত্রে গ্রন্থ পাঠ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে শুক্ল। এই অনিশ্চয়তা, এই ভয়, এ হচ্ছে দুর্ভাগার ভাগ্যের দুষ্ট গ্রহের কারসাজি। ওকে কোনোদিন স্বস্তি দেবে না। দেবে না নিশ্চিন্ততা —মুকুন্দ সরকারের সংসারে তুলসী কেন? তার তো থাকবার কথা নয়।

যদি তুলসী নামের ওই আনন্দ আর আশঙ্কার আধারটির এখানে স্থিতি না হতো? কোনো দুর্ভাবনাই তো থাকতো না শুক্লর। যে শুক্ল নাকি শৈশব থেকে ঘোলা জলের স্রোতে ভেসে ভেসে বেড়িয়ে এতো দিনে সহসা একটি নির্মল নদীর বুকে এসে পড়েছে।—

অনেকক্ষণ পরে নেমে আসে আকাশ থেকে।

উঠে আসে পাতাল থেকে।

মর্তের মাটিতে দাঁড়িয়ে খেয়াল হয় প্রদীপের তেলটা জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে সলতে থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই সেরেছে। নিভে গেলেই আবার চকমকি ঠোকার হাঙ্গামা। তাড়াতাড়ি ঘটি থেকে একটু তেল প্রদীপে ঢেলে দিয়ে সঙ্গে রাখা কাঠি দিয়ে ঠেলে উস্কে নিয়ে আবার গ্রন্থে মন দিতে বসে।

কিন্তু চোখ দিলেই কি মন দেওয়া হয়?

পাঁচ ॥

দেবনারায়ণ মল্লিকের গ্রন্থাগারে কত গ্রন্থ। তালপাতায় লিখিত, তুলোট কাগজে লিখিত, শোলার চাঁচ দিয়ে তৈরি ফলকে লিখিত, নবীন প্রাচীন বহু গ্রন্থ তাঁব সংগ্রহশালায়।

চেয়ে এনে পড়বে এমন সাহসী কল্পনা ছিল না শুক্লশিবের। অনুকূল ভাগ্যের খেলায় না চাইতেই প্রাপ্তি।

দেবনারায়ণ লক্ষ্য করেছিলেন, তার এই সংগ্রহশালায় এসে বসলে, ওই ব্রাহ্মণ তনয়ের মুখে চোখে যেন একটা আলোর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। আবার কী সতৃষ্ণ নেত্রে তাকায় ওই পেটিকাগুলির দিকে। তাকের উপরও কিছু কিছু রক্ষিত থাকে, যেগুলি হয়তো অসমাপ্ত, যে ব্যক্তি কাজ আরম্ভ করেছিল, শেষ করতে পারে নি। অথবা দৈবাৎ কোনো কোনো গ্রন্থ একাধিকও সংগ্রহ হয়ে গেছে। সেইগুলিই খোলা তাকে বাখা থাকে।

একদা দেবনারায়ণ ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলেন, শুক্লশিব তাকের ধারে দাঁড়িয়ে—একটি পুঁথির পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে চলেছে।

এমন আগ্রহ দুর্লভ।

দেবনাবায়ণেব নিজের পুত্রেরা ?

হায়! চার চারটি পুত্রের মধ্যে একটিরও যদি এ রকম পাঠস্পৃহা এবং এই অমূল্য বস্তুগুলির প্রতি কিছুমাত্র মূল্যবোধ থাকতো। কিছু মাত্র ছেড়ে কণামাত্রও নেই। বাবার এই অর্থ সামর্থের অপচয় যে

তাদের কাছে হাসির বস্তু তাও জানতে বাকি নেই দেবনারায়ণের। আর পাঠস্পৃহা ? সে কথা না বলাই ভাল।

আর এই তরুণ ব্রাহ্মণ সন্তানের মনোভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়, প্রাচীন পুঁথির এই ভাণ্ডারকে সে রত্নভাণ্ডারতুল্য মনে করে।

দেখলে আনন্দ আসে।

দেবনারায়ণ একটু গলা ঝাড়া দিয়ে নিজের আগমন সংবাদ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুক্লশিব ঘুরে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, এগুলি বাইরে পড়ে কেন ?

দেবনারায়ণ ওদের ইতিহাস ব্যক্ত করে বলেন, ওটি কি পাঠ করছিলে ?

শুক্লশিব আরো কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলল, পূজ্যপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুরের 'প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা।'

দেবনারায়ণ হেসে বললেন, এ ভাবে ক্লেশ করে পাঠ করবে কেন ; ওটি গৃহে নিয়ে গিয়ে সুস্থির হয়ে পড়গে।

না না। সে কী।

শুক্ল ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি অর্থাৎ এমনি ! এতো গ্রন্থ দেখতে বড় আনন্দ লাগে।

দেবনারায়ণ গাঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন; পুঁথি, গ্রন্থ ইত্যাদি দেখলে আনন্দ পায় এমন যুবক সংসারে বড় বিরল শুক্লশিব। এরকম যুবক দেখতে পেলে আমারও বড় আনন্দ লাগে। তুমি দ্বিধামাত্র কোর না যেটি পড়তে ইচ্ছা হবে গৃহে নিয়ে গিয়ে পড়বে। মুকুন্দর গৃহে গ্রন্থের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তোমার কক্ষে যত্নে রেখে দেবে, ইচ্ছামত পড়বে।

সেই আর এক ছাড়পত্র।

ঈশ্বরের অযাচিত করুণার মত।

আর অযাচিত করুণা ঘটভর্তি তেল। সারারাত্রি ব্যাপী পাঠ করতে ইচ্ছে হলেও অসুবিধা ঘটে না। নিতান্ত ক্লান্তি না এলে পড়েই চলে শুক্ল।

বিধিবদ্ধ ভাবে টোলে পাঠশিক্ষা না হলেও অবিরত গ্রন্থ পাঠেও যে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে, এটা শুক্ল নিজে নিজেই অনুধাবন করে। যা একবার পড়ে মর্মোদ্ধার করতে পারে না, বার বার পড়ে তা পারে।

সেদিন শুক্ল বিদায় নিলে দেবনারায়ণ অনেকক্ষণ নানা কথা ভাবতে লাগলেন।—ছেলেটি আসার পর, দেবনারায়ণ 'চাঁপতা' গ্রামে লোক পাঠিয়ে, ভালভাবে খোঁজ নিয়ে তার কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করেছিলেন। এবং জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ছেলেটি সত্যবাদী। যথার্থই উচ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভুত।

তদবধি মনের মধ্যে নানা তোলাপাড়া।

যদি উচ্চ বৈদ্য বংশোদ্ভুত হতো, তা' হলে দ্বিধামাত্র না করে, একমাত্র কন্যা উমারানীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে গৃহজামাতা রূপে চিরবন্দী করে রেখে দিতেন একে এই কাটোয়ার বাড়িতে। চারিটি পুত্র সন্তানের পর উপর্যপরি দুটি অকালমৃতা কন্যার পর এই উমারানী। একাদশে সদ্য পদার্পণ করেছে। শুক্লশিবের মত এত রূপের আধার না হলেও, বেমানান হবার নয় কিন্তু গোড়াতেই তো গলদ।—

অতঃপর পরবর্তী চিন্তা, গুরুদেবের পৌত্রীটি সম্পর্কে। দেবনারায়ণের গুরুবাড়ি শ্রীখণ্ডে; পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি একমাত্র কন্যা সন্তান রেখে অকালে গত হওয়ায় তার একমাত্র কন্যা, গুরুদেবের পৌত্রী সুরবালা গুরুদেবের বিশেষ চিন্তাস্থল। তিনিও সৎ কুলিন পাত্র পেলে গৃহ জামাতা রাখতে প্রস্তুত। বিধবা পুত্রবধূর সান্ত্বনা স্থল। তেমন ঘটনা ঘটাতে পারলেও তো এই রত্নটি দেবনারায়ণের হাতছাড়া হয় না।

এমন কি এই কাটোয়ার বাটি ও জমিজমা নারায়ণ গুরুদেবের নাতজামাইকে যৌতুকস্বরূপ দিয়ে ফেলে তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বেঁধে ফেলতে পারেন।

প্রায় বৎসর খানেক হতে যায়; শুক্লশিব এখানে এসেছে. পুঁথির কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে, এখন দেবনারায়ণের চিন্তা দ্রুত গতি নিয়েছে। অবশ্য দেবনারায়ণের কাছে কাজের অভাব নেই. আরো অনেক সদ্‌গ্রন্থ আছে, যা 'নকল' করিয়ে সংগ্রহশালায় রাখতে পারলে আনন্দ ও সম্পদ স্বরূপ। কিন্তু সে সবের ভবিষ্যৎ কি?

শুক্লশিবের মত এমন এক গুণগ্রাহী আগ্রহী এবং মূল্যবান বিচারে সক্ষম ব্যক্তির হাতে এই রত্ন ভার দিয়ে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারবেন দেবনারায়ণ।

কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবৎগীতার কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুক্লর চিত্তচাঞ্চল্যকর কোনো ঘটনা না ঘটানোই শ্রেয়। সুরবালা মাত্র নবম বর্ষীয়া। এখনো গুরুদেবের অস্থিরতা আসবার সময় আসেনি।

কাজেই এখন পর্যন্ত অন্তরের চিন্তা আপন অন্তরেই রেখেছেন দেবনারায়ণ। তবে ঠিক করছেন প্রথমে একবার গুরুদেবের কাছে গিয়ে প্রস্তাবটি জানিয়ে, তারপর কালনায় যাবেন পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। যদিও কাটোয়ার এই বাটি, এই উদ্যান, পুষ্করিণী, এবং জমিজমা সবই তাঁর স্বোপার্জিত। পিতৃ পিতামহের সম্পত্তি নয় যে বংশধারা অনুসারে দেবনারায়ণের পুত্রদের আপত্তি করার কিছু থাকতে পাবে। জাত ব্যবসা না করলেও, দেবনারায়ণ মল্লিক বহুবিধ ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নী করে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। পুত্রদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাটি নির্মাণ করিয়ে রেখেছেন, এবং ভূসম্পত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে। 'আলাদা' হবার জন্য নয়, সম্পত্তি স্বরূপ।

দেবনারায়ণের বিবেচনা প্রত্যেকের যদি নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি থাকে, তাহলে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'ভাগ বাটোয়ারা' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে না তারা। সুস্থ শান্ত চিত্তে কিছুদিন ও অন্তত 'একান্নবর্তী' ভাবে থাকতে পারে।

সেই একান্ন'র অন্নটা আসবে পিতৃসম্পত্তি হিসাবে যেটা এজমালি ভাবে থাকবে। কালনার সেই বৃহৎ চক্ মিলানো দ্বিতল প্রাসাদে স্থান অসঙ্কুলান হতে এখনো তিনপুরুষ লাগবে।

কী বিশাল আর ব্যাপক পরিকল্পনা মানুষের। তিনপুরুষ ধরে হাত পা ছড়িয়ে বাস করতে পারবে, এমন বাড়ি বানিয়ে রাখব।

মুকুন্দকে ডেকে পাঠাতে গিয়ে মনে পড়ল, মুকুন্দ গতকাল জানিয়ে রেখেছিল আজ দৌহিত্রীর বিবাহ উপলক্ষে শান্তিপুরে যাবে। বেশী না হলেও দু-চার দিনতো থাকতেই হবে।—তবে তো এখন গুরুদেবের কাছে শ্রীখণ্ডে যাওয়াও স্থগিত রাখতে হয়, কারণ তিনি সুদ্ধ চলে গেলে শুক্লশিব হয়তো অসহায়তা বোধ করবে।

অসহায়তাবোধ।

হ্যাঁ শুক্লশিব নামের তরুণ যুবকটি মর্মে মর্মে অনুভব করছে, অসহায়তা বোধের অর্থ কী ?

কিন্তু তার সঙ্গে দেবনারায়ণ মল্লিক নামের বিচক্ষণ প্রৌঢ়ের বিচক্ষণতার সম্পর্কের কোনো প্রশ্ন নেই। দেবনারায়ণ তাঁর বাটিতে উপস্থিত না থাকলেও গৃহ ভৃত্যরা তো থাকবে। ওখানে শুক্লশিবের সেইটুকুই যথেষ্ট।

অসহায়তা মুকুন্দ সরকারের গৃহে।

নাতনীর বিয়েতে তো আর মুকুন্দ একা যাননি, নিয়ে গেছেন তুলসীকেও। তুলসীর সেখানে না যাওয়ার, অথবা এখানে থাকার যুক্তিটা কি? ক্ষীণ একটা যুক্তিহীন আপত্তি তোলবার চেষ্টা করেছিল বটে তুলসী কিন্তু সেটা ধোপে টেকবার নয়, সেটা টিকবে কেন?

যেখানে মুকুন্দর নাতনীর বিয়ে হবে? সেই পাত্র পক্ষের তরফের সঙ্গে তুলসীর বরের কি যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, অতএব বরযাত্রী হিসেবে সে লোক বিয়ে বাড়িতে এলেও আসতে পারে। এইটা কি একটা আপত্তিযোগ্য কথা?

বিন্দুবাসিনী তো বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই গিয়ে বসে আছেন, ওজর আপত্তি যা কিছু পিসের কাছেই। মুকুন্দ তো শুনে হা হা করে হেসে ঘর ফাটালেন। যদি বরযাত্তির হয়ে আসে সে বেটা? হা হা।—এলেই বা? বিয়ে বাড়ি থেকেই কি তোকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে? তোর পিসি বলে গেছে নিশ্চয় করে নিয়ে যেতে।

মুকুন্দ সরকার আবার হেসে বলেন, আবার এ কথাও বলে গেছে, তার ভাইঝি যেন ডোম-ডোকনার মতন কুটুমবাড়ি না যায়। তাই চন্দননগরে লোক গেছে মাল সওদা করতে, তার ওপর বরাত দেওয়া আছে তোর জন্যে কাপড় আনিয়ে দেবার।

শুনে তুলসী রেগে বকে অস্থির হয়।

পিসির কথা না শোনবার জন্যে পিসেকে নির্দেশ দেয়, এবং বলে অনেক কাপড় আছে তার। কিন্তু মুকুন্দ সরকার কি বিন্দুবাসিনীর আদেশ পালন না করে তার ভাইঝির নির্দেশ মানবেন? অতএব তুলসী মঞ্জরীর জন্য শাড়ি আসে ধনিয়াখালি আর 'জনাই' গ্রামের নিকটবর্তী বেগমপুর থেকে।

ভাইঝির এখনো সন্তানাদি হয়নি জেনে মুকুন্দর সেই বুদ্ধিমান কর্মচারীটি নিয়ে এসেছে একজোড়া 'কালাপানি' শাড়ি, ও একজোড়া 'চাঁদের আলো' রঙা 'বেগমবাহার' শাড়ি।

দেখে—গালে হাত দিল তুলসী, ও পিসে, এই রংদার কাপড় পরে কুটুমবাড়ি যাবো আমি? তাও আবার জামাইবাড়ি! ক্ষ্যাপা না কি।

মুকুন্দ বেপোটে পড়তে রাজী নয়।

তাই সতেজে বললেন, কেন পরবি না? বনমালি বলেছে, সন্তানাদি হয়নি, এখন পরতে দোষ কী? তবে আর তাঁতিরা মাথা ঘামিয়ে নক্সা বানিয়ে এ সব কাপড় তৈরি করছে কাদের জন্যে? খুকিগুলা পরবে এই সব দশহাতি কাপড়?

তারপর বলে ওঠেন, শিবুর ক'দিন যাতে অসুবিধে না হয়, তার ব্যবস্থা করে যাবি। কেষ্টর মা তো ব্রাহ্মণ কন্যা, ওকেই বলে যাবি স্নান-টান সেরে এসে যেন শিবুর রান্নার যোগাড় করে দেয়।

তুলসী আস্তে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, তাই বলেছি।

কিন্তু শুধুই কি তাই বলে নিশ্চিন্ত আছে তুলসী? আগে থেকেই যতটা গুছিয়ে রেখে যাওয়া সম্ভব তার কোনো ত্রুটি রাখেনি সে। শুক্রর রান্নাঘরে জ্বালানি কাঠই রেখে দিয়েছে রাশিকৃত, রেখেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘৃত লবণ গুড় হরিতকী। আর রেখেছে মস্ত বড় কড়ির বোয়েমে ভবে সের দুই রেড়ির তেল। তার সঙ্গে মস্ত গোছাভর্তি শোলাকাঠি। আর রেখেছে একগাদা সলতে পাকিয়ে। এবং যাবার ক'দিন আগে থেকেই উঠতে বসতে পাখিপড়া করেছে শিবঠাকুরকে, এই উঁচু তাকের ওপর আমের আচারের বোয়েম রইল ঠাকুর। আর এই মাটিব তিজেলে তেঁতুল ছড়া। কুলের আচার তো তুমি ভালোবাসো না, তাই আর রাখছি না। তা' এসব খেও অবিশ্যি করে বাপু। ভুলে যেওনা যেন। আমসত্বও রেখে যাচ্ছি—পাথবের ঢাকনি বাটিতে। দুধেভাতে ভাল লাগবে।

শুক্লশিব বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। বলেছে, এতো কী হবে।

বাঃ। খাওয়াতো শুদ্ধু হবিষ্যির ভাতে ভাত। তাও ডালবাটা ভাতে জুটবে না। মুকে সোয়াদটা আসবে কোতা থেকে? এবার থেকে তুমি মাচ ধরো ঠাকুর।

মাছ ধরবো? হঠাৎ এ কী কথা?

কেন বাপু কতাটা এমন কি আশ্চয্যি? বামুন জাতে মাচ খায় না নাকি? বলে তা বড়ো তা বড়ো পণ্ডিত বামুনরা পাঁটা খেয়ে পার কচ্চে। মাচের মুড়ো নইলে নাকি চোকের জ্যোতি কমে যায়। আবার চোকের জ্যোতির জন্যে গুগলির ঝোল গিলে মরে। বুঝলে?

শুক্ল হেসে ফেলেছিল।

তুলসীর উচ্চারিত 'চোকের জ্যোতি' শব্দটার মধ্যে শ্লেষাত্মক সুর শুনে। হেসে ফেলে বলেছিল, তাদের তুমি খুব পূজ্যি কর তা' হলে?

তুলসী অজ্ঞাতসারে ফাঁদে পা দেয়। উত্তেজিত গলায় বলে, পূজ্যি করি? আমি? ওই লুভিষ্ঠে বামনাদের?

শুক্ল মুখে গাম্ভীর্য এনে বলে, কর না পূজ্যি?

গলায় দড়ি আমার। ওরা আবার বামুন না কি, আমি তো বলি বাম্না।

তো আমাকেও তাহলে ওই বাম্না বলতেই সাধ?

তুলসী চমকে ওঠে।

তুলসী নিজের স্বমত বিরোধী কথার জন্য লজ্জায় মনে মনে জিভ কাটে। তবে সহজে হারতে চায় না। বলে ওঠে, তুমি নইলে আর কে ওদের মতন হবে। জানি তুমি সাতজন্মেও অমন লুভিষ্ঠে হবে না। নেহাৎ আনাজ বেন্নুন পেটে পড়ে না, তাই বলা। একটা তো কিচু চাই?

বলেই ছুতো করে উঠে পালায়।

কিন্তু পালিয়ে থাকবে কোথায়? যতক্ষণ শুক্ল বাড়ি থাকে, ততক্ষণ তুলসীর সাধ্য কি যে অন্যত্র থাকে? অথচ ভয় আছে এটা শোভন

নয়। তাই একটানা থাকে না, ছুতোয় নাতায় উঠে যায়, ছুতোয় নাতায় আবার আসে। এসে দাঁড়ায়।

নয়তো এসে দরজার বাইরে কাঁথাখানা নিয়ে বসে। বলে, কেষ্টর মাকে বলে যাচ্চি ঠাকুর, উনি চানটান করে তোমার যা দবকার তোমায় শুদিয়ে যোগাড় দেবে।

শুক্ল হতাশ গলায় বলে, এতো কি দরকার আমার তুলসী ?

তুলসী।

নাম ডেকে কথা বললেই কেঁপে ওঠে তুলসী।

সাবধানে গলা ঠিক রেখে বলে, তবু বলে রেখে যাওয়া ভাল। ও আবার একটু বেহুঁশ আছে।

কতদিন থাকবে ওখানে ?

তুলসী মলিনভাবে বলে, সে আর আমি কি বলব ? মনিবের যা হুকুম হবে।

মনিব। তোমার আবার মনিব কে ?

পিসিই মনিব। যদি পিসের সঙ্গে চলে আসতে না দেয়। বলে 'থাক আরও দুদিন, আমার সঙ্গে যাবি।' কথাটা সত্যি। এর বিরুদ্ধে যুক্তি কোথায় ?

এখন অবশ্য শুক্লর মাথায় অনেক যুক্তি আসছে।

পিসে তো কাজের ধান্ধায় বেশী দিন থাকতে পারবে না মেয়ের বাড়িতে। তা' একা ফিরে এলে দুর্গতি হবে না তাঁর। উনিতো প্রায়ই সাত সকালে খেয়ে দেয়ে নৌকোয় গিয়ে চড়ে বসেন। কোথায় না কোথায় যাতায়াত। গঙ্গার ধার বরাবর যত শহর বাজার আছে চুঁচড়ো চন্দননগর, হুগলী, শ্রীরামপুর, বালি, ওতোরপাড়া শেষ তক্ সুতোনুটি, কলকেতা।

দেবনারায়ণ মল্লিকের ব্যবসা-বাণিজ্যের 'দেখনদার'দের মধ্যে তো মাথা হচ্ছেন মুকুন্দ সরকার! প্রধান ব্যবসাটি হচ্ছে কাঠের আসবাব-পত্রের। এইটিই মল্লিকের ঘরে লক্ষ্মীকে এনে বেঁধে রেখেছে।

মূলকেন্দ্র চন্দননগরে।

কাঠের উৎকর্ষে ওই অঞ্চলটি যেমন বিখ্যাত, তেমনি বিখ্যাত চন্দননগরের কাঠমিস্ত্রীদের হাতের কাজের উৎকর্ষে।—এখান থেকে পালঙ্কের কারুকার্য সম্বলিত বাজু পায়া ইত্যাদি তৈরি হয়ে নৌকোয় চেপে খুলনা যশোরের পথ ধরে বরিশাল বাখরগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে অন্য ছুতোর মিস্ত্রীর হাতে জোড় খেয়ে বড় বড় বাজা জমিদারদের ঘরের জোড়াপালঙ্ক হয়ে শোভা বর্ধন করে। এ ছাড়া এ তল্লাটের সর্বত্রই 'মল্লিক বাবুর' মালের সমাদর।

গৃহস্থের চৌকী দেরাজ, আয়নার ফ্রেম, বিগ্রহের 'কাঠরা' রাসমঞ্চ দোলমঞ্চের দোলনা, এ সবতো আছেই।

তা ছাড়া আছে সাহেবদের চাহিদায় নতুন নতুন নক্সার চেয়ার টেবিল, আলমারি আরাম কেদারা। চন্দননগরের ফরাসী সাহেবরা তো নিজেরা নক্সা এঁকে মাপজোপ বুঝিয়ে তালিম দিয়ে চন্দননগরের সূত্রধর সমাজকে আরো ওস্তাদ করে তুলছে। কলকাতায় এখন এদের দারুণ চাহিদা।

এই ব্যবসার সব কিছু মুকুন্দ সরকারের নখদর্পণে।

অবশ্য বনমালী আছে, কেশব আছে, রাখহরি আছে, কিন্তু মুকুন্দর তুল্য কে? তারা দেবনারায়ণের সুতোর ব্যবসাটি দেখে, দেখে আয়ুর্বেদীয় ঔষদের গাছ গাছড়ার।

দেবনারায়ণ নিজে কবিরাজী না করলেও, গাছ গাছড়া অর্থাৎ ভেষজ বৃক্ষ কিনতে বিশেষ পারদর্শী। অন্যান্য কবিরাজরা বিনা দ্বিধায় 'মল্লিকবাবুর' অবদান গ্রহণ করে।

আবার সুতোর ব্যবসাও আছে। কাটুনীরা ধামা ধামা সুতো নিয়ে আসে, এদিক ওদিক থেকে জমা দেয় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। বিক্রিও হয়

সেই ভাবে। দক্ষ তাঁতীরা ওই ভাবেই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে উপস্থিত হয়ে সুতোর গুণাগুণ বিচার করে দাম নির্ণয় করে, অতঃপর ওজন করে করে মাল বিক্রি বিলি। মল্লিকবাবুর সুতোর নামডাক আছে হাটে, মল্লিক মশাইয়ের সততা সম্পর্কেও।

এই নাম রক্ষার দায় দায়িত্ব তো মুকুন্দ সরকারের।

সেই লোককে বাড়িতে একা রেখে নিশ্চিন্ত থাকা কি ঠিক? হলেও দাস দাসীর প্রাচুর্য আছে বাড়িতে, কিন্তু তারা তো সবই সংসারের জন্যে। ধান চাল আছে মানুষটির, আছে ক্ষেত খামার, বাড়িতে ঢেঁকি গোয়াল জাঁতা কুলোর রবরবা, ওই সবেতেই পটু তারা। কিন্তু মুকুন্দর যে কখন মিছরির শরবৎটি দরকার, কখন ইসবগুলের শরবৎটির এ কথা ওরা কি জানে? বেলের পাণায় যে মুকুন্দ লবণ খান না, এটাই বা কার মনে থাকবে? তা ছাড়া বিছানা পাতা, জলের কলসী ঠিক সময়ে ভরা হলো কিনা দেখা, ধুতি চাদর মেরজাই ঠিকমত ফরসা রাখা, কাজ কি কম? কেউ না থাকলে মানুষটার কষ্ট হবে না?

এতো সব যে দরকার লাগে মুকুন্দ সরকার নামক ব্যক্তিটির, সেটা শুক্রশিবের জানার কথা কি? যে নাকি নিতান্তই বহির্বাটির বাসিন্দা, যার পরিচয়টা হচ্ছে 'আশ্রিত'।

কিন্তু তাতে কি? জানার জন্যে জগতে কত দরজা জানালা!—তুলসীর বাক্‌বিন্যাসের সূত্রেই এতো সব জানা হয়ে গেছে শুক্রশিবের।

—কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ উঠে পড়ে এই রে ভুলে গেছি পিসের মিছরির পাণা গুলে রেখে এসেছি নেবু রেখে আসতে ভুলে গেছি। দেকি গাচে পাতিনেবু আচে কি না।—বলে, ওই যাঃ পিসের পানকটা সাজা বাকি যে—এমা! আমি বসে বসে গাল গপ্‌পো করচি, ওদিকে পিসের জন্যে ফল কেটে রাকতে বাকি।—নাঃ আমার যে কী মরণদশা,

মুড়ি ভাজুনিকে খবর পাটানো হয়নি, ঘড়ার তলানি মুড়ি মিইয়ে বসে আচে। যাই দেখি পিসের খাবার সময়ের মধ্যে একখোলা অন্তত ভেজে দিতে পারে কিনা।

এই সব শুনে শুনেই পিসের প্রয়োজনের বস্তুর তালিকা শুক্লর মুখস্থ।

হায় ভগবান! বিন্দুবাসিনী দেবীকে এমন হৃদয়হীনা করেছ কেন? স্বামী সম্পর্কে তাঁর কোনো চিন্তা উদ্বেগ নেই?

রান্নাঘরের দিকে যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না চক্‌মকিটা পর্যন্ত ঠুকতে। কিন্তু না করলেও তো নয়। তুলসী আবার সবকটা লোকজনকে হুঁশিয়ার করে রেখে গেছে, আলাভুলো ঠাকুর মশাইকে একটু দেখিস। রাঁদলো খেলো কিনা খোঁজ নিস।

অতএব গরুর খড়কাটুনি বুদো থেকে, মোক্ষদা, জগন্নাথ, কেষ্টর মা, অঘোরদাস পর্যন্ত একবার করে খোঁজ নিতে আসে। অগত্যাই রান্নাঘরে এসে বসতে হয়।

কাঠ জ্বলতে থাকে, বোগ্‌নোয় জল ফুটতে থাকে, ধোয়াচাল পাশে রেখে ওই আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে শুক্ল, আমার এই তুলসীর জন্যে মন কেমন করাটা ঠিক নয়। এতো একরকম পাপ।—তবে আমি কেন কিছুতেই এটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না। জেনে বুঝে দোষ করাটাই তো বেশী দোষের।

ভাবতে ভাবতে দোষের সেই 'ঘাট' থেকে কখন যে ডুবজলে গিয়ে পড়ে খেয়াল থাকে না।

নাতনীর বিয়েতে এসে আহ্লাদে ভাসছেন বিন্দুবাসিনী।

অবশ্য এ তো আহ্লাদে ভাসবারই ব্যাপার. সধবা দিদিমা নাতনীর বিয়েতে নিয়ম লক্ষণের কাজ করছেন, ছিরি কুলো বরণডালা সাজাচ্ছেন. 'ছিরি' গড়া বাবদ চওড়া লালপাড় শাড়ি পেয়েছেন. 'নমস্কারী বাবদ' তসর গরদ পাবার আশা।—আর কুটুম বাড়ির সবাই হাতে হাতে মুখে মুখে যত্ন করছে। মেয়ের পাড়ার জ্ঞাতিরা পর্যন্ত মাউইমা বলে সমীহ করছে, এতেও আহ্লাদ হবে না? মেয়ের শাশুড়ীটি নেই বলেই না এতো? মেয়ে গিন্নী। তার ছোট জায়েরা বড়জা বলতে তটস্থ. এ দৃশ্য দেখেও সুখ। কিন্তু—এ সবই তো' এহো বাহ্য!

বড় মেয়ের বাড়ির কাছাকাছি সেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। দুজনের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কও আছে। অতএব সেজমেয়ে শুধু 'বোনঝির বিয়ে'তে নেমন্তন্ন খেতে আসার মত আসেনি.—(যেমন ছোট মেয়ে) সর্বদাই আসছে যাচ্ছে। আর সেইখানেই বিন্দুবাসিনীর আহ্লাদের নদী বইবার সুযোগ পেয়েছে। 'সোনার গৌরাঙ্গ' অর্থাৎ গোরাচাঁদ তার মায়ের দিকে যাচ্ছে না, মা কোলে নিতে এলে দিদিমার আঁচল চেপে ধরে আঁ আঁ করছে। এমন কি নিজের সাতটা ভাই বোনকে দেখেও খেলতে চাইছে না! তারা যতই ডাকাডাকি করছে. ততই দিদিমার পিঠের আড়ালে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছে। অথচ সময়ের সীমা একই। নিজেদের বাড়িতে ছিল দেড় বছর বয়স অবধি. আর পরবর্তী দেড় বছর দিদিমার কাছে।

আসলে—অনুভূতির উন্মেষের সময় থেকেই ছেলেটা দেখছে মস্ত একটা বাড়িতে দু তিনটি মাত্র লোক। চকচকে ধোওয়া মোছা লম্বা লম্বা টানা দালান দাওয়া। উঠোন ফাঁকা খাঁ খাঁ। সবটাই শুধু। সেটাই চোখে অভ্যস্ত। এখানে বিয়ে বাড়িতে চারিদিকে লোকে লোকারণ্য. গোলমাল হৈ চৈ, এবং সব মুখগুলোই অপরিচিত।

একেই তো এতোগুলো 'মুখ' ছোট ছেলের পক্ষে বিভ্রান্তিকর. তায় আবার সকলেই 'গোরাচাঁদ'কে দেখি, দেখি কেমনটি হয়েছে. বলে তাকেই একহাত নিতে আসছে।

এই কাঁটাবনের মধ্যে একমাত্র নিশ্চিন্ততা 'দিদিমা'।

কাজেই সেই একমাত্র আশ্রয়কে আঁকড়াবে এটাই শিশু মনস্তত্ত্ব। বিশেষ করে যে দিদিমা (বাড়িতে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও) সর্বদা গোরাচাঁদকে কোলের মধ্যে চেপে ঘুরে বেড়ান। সর্বদা একটা দেহের সান্নিধ্য সংস্পর্শ এমনই ব্যাপার যে, সেটার অভাব ঘটলেই শিশুর অসহায়তাবোধ আসে।

বিন্দুবাসিনী নিজে তাঁর রোগা হাড়ে ভারী পাথরকুচি ছেলেটাকে সর্বদা বয়ে না বেড়িয়ে যদি গাট্টাগোট্টা নিকষ কালো 'জগন্নাথ' দ্বারাই— বাহিত হতো, তাকেও এই ভাবেই জড়াতো। ভাই বোনদের সে চেনেই না। খেলতে অভ্যস্তও নয়।

কারণ যাই হোক, বিন্দবাসিনীর তো দশজনের সামনে জয়পতাকা উড়লো। পতপতিয়েই উড়লো।—যে দেখছে সেই একবার করে বলছে, ও বাবা ছেলে দিদিমার আচ্ছা ন্যাওটা তো। একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারে না।

এই তো! এইটুকুর জন্যেই তো এতোদিনের সাধনা। সর্বস্ব ভাসিয়ে নাতিকে 'ন্যাওটা' করার তালেই তো বিন্দুবাসিনী তাঁর সমগ্র কূটনীতিটি কাজে লাগিয়েছেন।

মেয়ে যদি একবারও ক্ষোভের গলায় বলে থাকে, 'ছেলেটাকে তো একেবারে জরদগব তৈরী করে বসে আছো মা! না জানে খেলতে, না পারে কথা কইতে।'

তা'তে কী এসে যায় বিন্দুবাসিনীর? বিন্দুবাসিনী তো আরো সুযোগ পেলেন। একগলা ঘোমটার মধ্যে থেকেই বেশ স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করতে পেলেন, বেশ তো মা, ছেলেকে তবে ফেরৎ নাও। তোমার ছেলেকে তুমিই মানুষ করো। কতা শেকাও, দস্যিবিত্তি শেকাও, যা মন চায় করো। দোষের ভাগী হতে চাইনে আমি।

বলা বাহুল্য এ কথার প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটার মায়েরই ছিছিক্কার নিন্দে হলো।—মায়ের মুখের ওপর এমন কথা বলা! যে মা তোর

ছেলেকে প্রাণপুতুল করে মানুষ করছে তোর তো বছরে একটা করে ছেলে মানুষ করতে জিভ বেরিয়ে যায়। আর ছেলেপুলে খায় পরেই বা কতো? আর ও ছেলে মানুস হচ্ছে রাজপুত্তুরের মতন। কথা কইতে শিখতে যদি একটু দেরীই হয়, ক্ষতিটা কী? সারা জন্মই তো কথা কইবে। বোবা তো নয়। এই যে ওর ছোটভাইটা তোমার 'কোলের' ছেলেটা (মানে এখনো পর্যন্ত রয়েছে তাই। ক' মাস পরে আর তা থাকবে না) সে চড়বড়িয়ে কথা কইছে বলে তোমাব এমন কি চারখানা হাত পা বেরোচ্ছে?

বড় ধিক্কৃত হল বিন্দুবাসিনীর মেজমেয়ে।

তৎসত্বেও বিন্দুবাসিনী দশজনের সামনে বললেন, গোরা এবার থেকে তুই তোর মায়ের কাছে থাকবি তো? আমি চলে যাব বুঝলি? যা মার কাছে যা—বলে ঠেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গোরাচাঁদ তীব্র প্রতিবাদ করে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল।

এই সব ঘটনা আহ্লাদে ভাসার যোগ্য নয়?

এবার তো ফিরে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে হোম যজ্ঞ করে গোরাচাঁদকে নিজের এক্তারে পুরে ফেলতে পারবেন।—এই নাট্য মঞ্চে এসে পড়লেন, মুকুন্দ সরকার তুলসীকে নিয়ে, সঙ্গে মোক্ষদা। বরের ঘর পালানো যুবতী মেয়েটাকে তো আর একা পিসের সঙ্গে আসা ভাল দেখায় না? হলেও পিসে পিতৃতুল্য, আর বয়সই পঞ্চাশোত্তীর্ণ।

তা' বিন্দুবাসিনীর এই জয়ের দৃশ্য মুকুন্দ দেখলেন, তুলসী দেখল, মোক্ষদা দেখল। তার মানে সাক্ষী থাকল।

তুলসীকে দেখে গোরাচাঁদ অবিশ্যি তার দিকে কিছুটা ধাবিত হলো। সেটাও সুবিধে। আগামী কালই বিয়ে—বিন্দুবাসিনীর ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। গোরা তো এক বিন্দু ছাড়ছিল না, নাইতে খেতে দিচ্ছিল না, এ তবু একটু আসান হল।

সবটা মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে বিন্দুবাসিনীর এখন সৌভাগ্যের গ্রহ চলছে।

বললেন, তোকে সঙ্গে নে এলেই হতো। তোকে তবু একটু ভজ্জচে। আমায় তো এটুলীর মতন কামড়ে ধরে বসে থেকেচে অ্যাতোদিন। বরের ঠাকুর্দার হঠাৎ মরণ বাঁচন ব্যামো হওয়ায় বেটা পিচিয়ে গিয়ে আটকা পড়ে গেলাম তো। তা ভগবান মুক তুলে চাইল, বেঁচে উঠলো বুড়ো। নচেৎ পুঁটিকে জন্মের শোদ অপয়া নাম কিনতে হতো।

বললেন বটে, কিন্তু মনে মমে ভাবলেন, তুলসীকে ভাগ্যিস সঙ্গে আনেননি। আনলে তো খানিকটা 'ঢলে' তুলসীর দিকে চলে যেতো। বিন্দুবাসিনীর মহিমা সমগ্রতা কারো চোখে পড়তো না।--আবার বিয়েটা পিছিয়ে যাওয়ায় সে মহিমা দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রমাণপত্রে পাকা করে ফেলল।

অনেকেই তো বলছিল, আহা মায়ের কাছে যাবে কি. মাকে তো চেনেই না। এতোদিন দেখেনি। দেখতে আবার মনে পড়বে।

কিন্তু এতোদিন দেখবার সময় পেয়েও গোরাচাঁদ তার নিজের মায়ের সঙ্গে নিতান্তই বিশ্বাসঘাতকতা করল। অতোটুকু ছেলের মধ্যে কি 'অভিমান' জন্মাতে পারে? সে কি ভাবতে পারে, তুমি তো আমায় বিলিয়ে দিয়েছ আবার কেন?'

শিশুর হৃদয় রহস্য শিশুই জানে।

বিন্দুবাসিনীর হৃদয় রহস্যটা কারো কাছেই অজ্ঞাত রইল না। তিনি তাঁর মেয়ের এই পরাজয়ে পরমানন্দে ভাসছেন।

এই আনন্দে ভাসার ক্ষণে—তুলসীকে দেখে আরো আনন্দ। তুলসীও তো বিন্দুবাসিনীর আর একটি বিজয় গৌরব চিহ্ন। বরের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে পিসির বাড়ি আশ্রয় নেওয়া তুলসী রূপে আর স্বাস্থ্যে যেন টন্ টন্ করছে। কেউ বলতে পারবে না—পিসির বাড়িতে দাস্যবৃত্তি করে দুটো ভাত কাপড় পাচ্ছে তুলসী মঞ্জরী নামের মেয়েটা।

চাঁদের আলো রঙা বেগমবাহার শাড়ি পরা তুলসী যখন এসে দাঁড়াল চোখে পড়বার মত। বিন্দুবাসিনীর হৃদয়-রহস্য সত্যিই বিচিত্র। তাঁর

নিজের মেয়েদের থেকে সম্পর্কিত ভাইঝি তুলসীকে রূপসী লাগছে এটাতে তাঁর সন্তোষ আসে কোথা থেকে ?

কিন্তু সত্যি তুলসী হঠাৎ রূপসী বলে গণ্য হয়ে উঠল কেন ? জন্মাবধি, অথবা বিবাহ অবধি তুলসীকে কেউ বলেনি বেশ দেখতে ভাল দেখতে। দুঃখে কষ্টে মানুষ একটা মেয়েকে তাকিয়ে দেখেছেই বা কে ?

বিয়ের পর যে তিনটে বছর বরের বাড়িতে ছিল, সেই তখন তুলসীর হাড়ে ছিল না মাংস, মুখে ছিল না বয়েসের জেল্লা, এবং মেজাজে তার সর্বদা বেজারের সুর বাঁধা থাকতো।—আর সাজ সজ্জাও দীনহীন। সতীনদের হাততোলায় পড়ে থাকা সেই মেয়েটাকে 'রূপসী' বলতে গেলে তো হাস্যাস্পদ হতে হতো !

মুকুন্দ সরকারের লক্ষ্মীর ঘরে এসে তুলসীকে গিন্নীদের ভাষায় যেন ভেঙেচুরে গড়েছিল।

কিন্তু শুধুই কি তাই ?

দেবী প্রতিমার গঠনে আসল সৌন্দর্য ফোটে তো মুখের গর্জন তেলে। আর আসল মহিমা ফুটে ওঠে, পূজকের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রে।

।। ছয় ।।

কিন্তু সেই পূজক কি জেনে বুঝে মন্ত্রপাঠ করেছে ? এ তো এক অবোধ অনভিজ্ঞের অজ্ঞাতসারে উচ্চারিত অজানা মন্ত্র। কিন্তু মন্ত্রের কাজ মন্ত্র ঠিকই করে। প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। দেবীর সেই মধুর সুন্দর মহিমা উজ্জ্বল মূর্তির অলৌকিক লাবণ্য চোখে পড়েছে।

চোখে পড়েছে সেই অবোধ পূজকেরও।

যাত্রাকালে মুকুন্দ শুক্লশিবের ঘরের দরজায় এসে হাঁক পাড়লেন, আমরা তাহলে রওনা দিচ্ছি। সাবধানে থেকো বাপু। খাওয়া দাওয়ায় যত্ন নিও। এ তো তোমার নিজের বাড়ি ঘর। আমি অবিশ্যি দেরী --করবো না, বিস্তর কাজ। আবার আমি ফিরে এলে 'বাবু' বোধ হয় তাঁর গুরুর বাড়ি যাবেন। যাই হোক এসে যেন সুস্থ দেখি বাপু।

শুধু একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, কেন ? অসুস্থ হবো কেন ?

আহা হবেই কি আর ? শুনি তুমি খাওনা দাওনা। বকে ঝকে খাওয়াতে হয়। বকবার লোক না থাকলে স্বাধীন হবে তাই।

হেসে উঠলেন হা হা করে।

তারপর পিছন ফিরে পশ্চাতবর্তিনীর প্রতি লক্ষ্য ক'রে বললেন, তুলসী, চল মা চল, আর দেরী নয়।—তা কই রে শিবুকে পেন্নাম করলি নে ? আমাকে তো উনি কিছুতেই পায়ে হাত দিতে দেবে না। তোরই হোক পুণ্যিটা।

এগিয়ে এল পুণ্য সঞ্চয় করতে, সেই 'চাঁদের আলো' শাড়িতে মোড়া প্রতিমা।—মুকুন্দ সরকারকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে পায়ে হাত দিতে দেয় না শুক্ল, কিন্তু তুলসীমঞ্জরী নামের মেয়েটার পক্ষে বাধা কোথায় ?

ওই এক লহমার স্পর্শে যার চেতনার অণু পরমাণু মঞ্জুরিত হয়ে উঠল।

নৌকোয় চড়া পর্যন্ত বোধহয় যাওয়া উচিত ছিল।

পরে ভেবেছিল শুক্ল।

মুকুন্দ সরকার আমার আশ্রয়দাতা। অন্নদাতা। অহেতুক স্নেহভারে যিনি শুক্লকে কৃতজ্ঞতাপাশে বন্দী করে রেখেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ওই উচিতবোধটা মনে এসে মনের মধ্যে যেন হাহাকার করে উঠল। আশ্চর্য! এটা আমার মনে এল না—এখন আর ছুটে গিয়ে লাভ নেই। এতোক্ষণ নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু সেই ভরা গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকোটা এগিয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে দৃষ্টির অন্তরালে বিলীন হয়ে যাওয়ার 'ছবি'টা মনে মনে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আচ্ছা এই 'অনেকক্ষণ'টা কী করছিল শুক্লশিব ?

কোথায় ছিল সে।

জানে না। অনেকখানিটা সময় হারিয়ে গেল শুক্লশিবের হিসেবের খাতা থেকে। শুক্লর কিছুতেই মনে পড়ল না সে কোথায় দাঁড়িয়েছিল, কী ভাবছিল, কেন ভুলে গিয়েছিল মুকুন্দর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর ঘাট পর্যন্ত না যাওয়াটা অকর্তব্য।

বিহ্বল অভিভূত সেই মুহূর্তটা অবশ্য পার হয়ে গেল। কিন্তু তার রেশটা রয়ে গেল। তাই হঠাৎ হঠাৎই শিবঠাকুর চলমান পরিস্থিতির মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়।

ভৃত্য মহলে এই নিয়ে আলোচনা।

যখন তখন শিবঠাকুর অমন ফ্যালকা মুকো হয়ে বসে থাকে কেন বল্‌তো? যাানো কোতায় মন, কোতায় প্রাণ।

আহা ঘরবাড়ির কতা মনে পড়ে আর কি। য্যাতোই রাজ ঐশ্বর্যতে থাকুক, আপন ভিটে বলে কতা।

মা বাপ তো নাই।

তা নাই থাকলো, জন্মভূমিটাতো আচে। পেথম যোয়ান হয়ে যাকে দেকেচে। তারই মায়া।

তা' বটে।

কিন্তু মহিলা মহলে আলাদা সুর।

মোক্ষদা বলে, কেষ্টর মা, তুমি আমার বন্ধুর মতন, তাই সাহস করে বলচি, কারু কাচে গপ্‌পো করতে যেওনি, তুলসীদিদি বে' বাড়িতে যাওয়া এস্তোক শিবুঠাকুরের ভাবগতিক দেকচো?

তুই যদি বললি মোক্ষদা, তো বলি, যাওয়া এস্তোক কেন, আগে থেকেই দেকচি। গিয়ে তো আরো। মায়ের যেমন হাল্‌কা বুদ্ধি ওই আগুনের খাপ্‌রা ডব্‌কা যুবুতি মেয়েকে ধরে দেবেন ঠাকুর মশাইয়ের স্যাবাযত্ন করতে।—হাঁলা, কতায় বলে 'ঘি আর আগুন!' মা অ্যাতো জানে আর এ জানে না? দেকি আর অবাক হই, বলি ছোটো মুকে বড় কতা সাজে না। তবে য্যাতো ভালো ছেলেই হোক, আর য্যাতো পণ্ডিতই হোক, বয়েসের ধম্মো আপন কাজ করবেই। –এই তো দেকচি

তুলসীদিদি গিয়ে পর্যন্ত ঠাকুর যেন সব্বদা বিভ্যান্ত।—আর তুলসীদিদিকে তো দেকেইচি সব্বদা, উচাটন।

যা বলেচো কেষ্টর মা। মানুষ জনের দিকে তাকিয়ে দেকচে না আব।—আগে কতো কতা কইতো মোক্ষদা মাসি মোক্ষদা মাসি' করে, বলতো কতা না কইলে পেরাণ হাঁপায় আমার। এই কাটোয়া শহরের সবাইয়ের বিত্তান্ত শুনতো মন দে, জিগ্যেসবাদ করতো। আমার ছেলেবেলার কতা, বরের কতা, শোউরবাড়ির কতা সব শুদোতো। গাচ থেকে প্যায়রা পেড়ে এনে দিতে বলতো, করমচার আচার করতে জানি কিনা শুদোতো, সে সব ধুয়ে মুচে গেচে। এখোন উদয়াস্ত ঠাকুরের তরে পথ পানে চোক। যেন রাধিকে ঠাকরুণ। ও মেয়ে গোল্লায় গ্যালো বলে। এই তোমায় আমি বলে রাকচি কেষ্টর মা।

'যাবে' কি মোক্ষদা, গিয়ে বসে আচে। একদণ্ড সুস্থির নাই। ভাতকটা গালে দিচ্চে, যে কে কেড়ে নে যাবে, এমনি তরো তাড়া। খেয়েই ছুটলো ওঘর পানে।—এইস্তিরী মানুষ, মাচ ফেলে চলে যায়, বলে, বড়ো কাঁটা। তা ক্যানো, কাঁটা বাচতে যদি সোমায় খরচা হয়ে যায়।

ঠাকুরটি ছেলে ভালো, ওনার খপ্পরে পড়ে বেগড়ালো। বুঝলে কেষ্টর মা।

মেয়েছেলে সোয়ামীর ঘরছাড়া হোয়ে থাকলেই আগুন জ্বালে। 'সতীন নে' ঘর করতে পারবনি। এ আবার কি আদিখ্যেতা। বাপ মা তালে নিঃসতীন ঘরে দ্যায়নি ক্যানো।

মা বাপ ছেলো নাকি? মামার গলগ্গেরো হ'য়ে পড়ে ছেলো, মামা যা পেয়েচে ধরে দেচে।

তবেই বল মোক্ষদা। যার কপাল এমন তেঁতুলগোলা তার আবার অ্যাতো অঙ্খার ক্যানো? বর বুড়ো! বলি মা দুগ্গার বর বুড়ো নয়? সোয়ামীর বয়েস বিচার করতে যাবে তুমি? যাই ভাগ্যিস বড়মানুষ পিসে পিসি ছেলো, তাই তরে গেলি।

সেইটিই 'কাল' হয়েচে কেষ্টর মা। পিসির আস্কারাতেই অ্যাতো বাড়বিদ্ধি। তবু মিচে বলবো না ছেলো ভালো। যেদিকে দরকার সেদিকে তুলসীদি। মানুষের ওপর মায়া মমতা। শূন্য সংসারে তবু একটু কলবলানি শুনতে পেতুম। বাবু ওই ঠাকুরটি এনে ঘরে পিতিষ্ঠে করেই এইটি করলো।

যা বললি মোক্ষদা, যেমন কর্তা তেমন গিন্নী। দু' মানুষেরই বুদ্ধির ঘটে ছ্যাদা।—এ কি পাতরের ঠাকুর যে, পিতিষ্ঠে করলেই হলো? এ হলো রক্ত মাংসের ঠাকুর।—তবু খুবই সৎচরিত্তির তা বলবো। আবডাল থেকে দেকি তো—আমাদের ধিঙ্গী অবতারই একখান কাঁতা হাতে নে ওই দোরে গে বসে,—সেলাইয়ের ছুতো দেকিয়ে গলর গলর গপ্পো করতি থাকে। ঠাকুর মাতা নাবিয়েই উত্তুর দেয়, চোক তুলে তাকায় না।

গিন্নী বাড়ী নেই, তাই এই মহিলা যুগলের অগাধ বাক্ স্বাধীনতা। অবাধ চিন্তা প্রবাহ। এতোদিন যাবৎ যেসব কথা ভাবতে মনেও পড়েনি এখন সেগুলোও ভাবতে বসেছে।

তা ওটাই হয়তো মানুষের স্বভাবধর্ম। চর্চাতেই উৎকর্ষ। পাঠ চর্চা, পরচর্চা, হৃদয় চর্চা।

তাই ওদের ওই আলোচনার প্রধান নায়ক, অথবা প্রধান আসামী শিবঠাকুরের মধ্যে সেই চাঁদের আলো রঙা শাড়ির চকিত ছায়া, আর পায়ের উপর চকিত একটু স্পর্শ খোদাই হয়ে বসতে থাকে। কারণটা ওই একই। চর্চা।

একদার যে কথোপকথন একদায় বাতাসে মিলিয়ে গেছে, সেই কথাই আবার বর্তমানের বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়।

ঠাকুর তোমার মাকে তোমার মনে আচে?

আছে বৈ কি! আমার বয়সতো তখন নেহাৎ শিশু বয়স নয়, ছয় পূর্ণ হয়ে গেছে।

আর বাপকে?

সেও আছে বৈকি। একই দিনে তো মা বাপ দুজনকেই হারাই।

ইস্! আহা, নৌকাডুবিতে বুঝি?

নাঃ। পিতার মৃত্যু সন্ন্যাস রোগে, মায়ের মৃত্যু সহমরণে।

অঁ্যা।—স-হ-ম-র-ণে! তোমার মা 'সতী' হয়েছিলেন ঠাকুর?—

কথার সময় তাই বলা হয়। কিন্তু আমি জানি আমার মা 'সতী' ছিলেন বলেই জীবন্ত শরীর নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন।

উঃ মাগো। ভাবতে পারা যায় না গো। এই রক্ত মাংসোর শরীরটা যাতে আগুনের একটু ছ্যাঁকা লাগলে সহ্যি হয় না, সেই শরীরটা নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেওয়া—কী করে যে পারে মানুষ!

মানুষে কী না পারে তুলসী? মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। আর ধর্ম পুণ্যির লোভ থাকলে তো কথাই নেই। ধর্মের নামে লোকে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিতে পারে, আপন হাতে পুত্রের মাংস কেটে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে পারে।

ওঃ 'বৃষোকেতু'র পালার কথা বলচো? সে তো যাত্রা পালার কতা।

পালা তো এমনি লেখা হয়নি। যা ঘটেছিল সেই কাহিনী নিয়েই পালা।—

কি জানি বাবা! কিন্তু তোমার কী দুঃখু ঠাকুর। মা বাপ হেন জিনিস, একদিনে চলে গেল।

তোমারও তো মা বাপ নেই।

আমার তো মরেচে সে কোন ছোটকালে। অগ্যানে। মা তো আঁতুড়েই মরেছিল, বাবা বছর তুই পরে।—কিন্তু তোমার যে মনে আচে তাতেই কষ্ট বেশী। কিন্তু একটা কতা শুদোবো ঠাকুর ? বল হাসবে না, রাগ করবে না ?

কী আশ্চর্য ! কী কথা না শুনে বাক্যদত্ত হই কি করে ?

বলচি, মা সহোমরণে মরলে তোমার শুদুই কষ্ট হয়েছিলো ? মায়ের ওপর রাগ হয়নি ?

তুলসী !

কী হল ? রাগ করলে তো ?

নাঃ। রাগ করিনি। অভিভূত হচ্ছি। আজ পর্যন্ত এ কথাটা কেউ প্রশ্ন করেনি আমায়। কেউ ভাবেও নি। তাই আমিও ভাবতে সাহস করিনি। সত্যিই তখন তুঃখের থেকেও বেশী হয়েছিল রাগ। বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল মাকে। বাবা না হয় ব্যামোয় গেলেন, এক মুহূর্তের ব্যাধি।—কিন্তু মা ? মনে হয়েছিল মা কী নিষ্ঠুর। নিজের মান সম্মান আর ধর্মের অহঙ্কারটাই বড় করে দেখলেন। একটা শিশুর মুখ পানে চাইলেন না—কিন্তু আশ্চর্য, তোমার এ কথাটা মনে এলো কী করে ?

আহা ! শুনেই তো মনটা ধড়াস করে উঠল ঠাকুর। আর তক্ষুণি মনে হল, বড্ড নিষ্ঠুর বাপু। দেশে গাঁয়ে এই নিয়ে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

তা তো যাবেই। ওই জন্যিই তো মরা।

তাও ঠিক নয়।—অনেক মেয়ে বৈধব্যের কথা ভাবতে পারে না।

তার মানে হচ্ছে, নিজেকেই সব চে' বেশী ভালবাসে তারা।

আশ্চর্য।

ও মা ! রেগে গেলে ঠাকুর ?

নাঃ রাগের কথা নয়। ভাবছি বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা যা ভাবেন না, তুমি তাই ভাবছো। সেইটাই আশ্চয্যি।

আমি এমন কত যে আবোল তাবোল ভাবি, আর বলি। পিসি বলে, পাগল। বলে মাতাটা তোর একেবারে খারাপ হয়ে গ্যাচে তুলসী।

আবোল তাবোল নয়।

নয়?

না। এ সব হচ্ছে ভিতরের চিন্তাশক্তির প্রকাশ।

হি হি হি। পিসিকে একবার বুঝিও তো ঠাকুর। আমি বলি, সকাল সন্ধ্যে যে দুয়োরে দুয়োরে গঙ্গাজলের ছড়া দাও এর মানে কী বল তো, পিসি রেগে বলে, মানে আবার কি যা কালের নেয়ম, তাই করি।—হি হি হি। চেরকালের নেয়মটা হলো কেন তা ভাবো? পিসি বলে, ভেবে আমি কি চতুর্ভুজা হবো শুনি?—'চতুর্ভুজা' হবার আশ্বাস না থাকলে, পিসি এক চিল্‌তে ভাবনাটুকুও ভাববে না। হি হি।

আচ্ছা তা ভাল। কিন্তু তুমি নিজেই বলতো কেন নিয়ম।

ও আমি কোনকালে ভেবে ভেবে বার করেচি। সকাল সন্ধ্যে দু বেলা তো উটোন পাটান ঝেঁটোনো হয়, ধ্‌লো ওড়ে। সেই ধূলো ঘরে গে ঢোকবার ভয়ে চৌকাটে জলের ছড়া দেয়া।

হুঁ! আচ্ছা ভেবে ভেবে বলতো রাত্তির বেলায় কেন গাছে পালায় হাত দিতে নেই?

এ মা এ আবার একটা শক্ত কথা নাকি? রাতের বেলা গাছ গাছালিতে কখন কি সাপ খোপ পোকা মাকড় এসে সেঁদিয়ে বসে থাকে। তাই। সব নিয়মেরই মানে আচে ঠাকুর। এই যে, কার্তিক মাস ভোর ছাতে—আকাশ-পিদিম দেয়, বোশেখ মাস ভোর তুলসী তলায় জল দেয়, এসবেরই মানে আচে তো আমার কতা শুনে পিসে পিসি হাসে, সবাই হাসে। মোক্ষদা, কেষ্টর মা, জগন্নাথদা সবাই।

আমি কিন্তু হাসছি না। বলতো কেন আকাশদীপ? আমি তো জানি না।

আহা! তোমার যত ইয়ে। তুমি আবার জানোনা। কার্তিক মাসে শ্যামাপোকার দহরম মহরম। তাই সেই আপদগুলোকে আকাশে পাঠিয়ে দেবার ফন্দি!

আর তোমার গোড়ায় জল দেওয়ার?

আমার গোড়ায় জল?

বাঃ এই তো বললে বোশেখ মাস ভোর—

ওমা। ছি ছি। হি হি! আমি তো চমকে গেচি।—তা আমি তো আর তুলসী-'গাচ' নই। আমি তো তুলসীমঞ্জুরী।

কী? কী বললে? তুমি কি?

না বলবো না। তুমি তামাসা করচো।

না, না! তামাসা নয়, বিশ্বাস করো। শুনতে পাইনি।

আমার নাম তো আর শুধু তুলসী নয়, এই কতাই বলেচি। আস্ত নামটা তো তুলসীমঞ্জুরী।

বাঃ! এমন সুন্দর নাম তোমার। জানতাম না কোনোদিন। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যেকার শব্দ। কিন্তু 'মঞ্জুরী' নয়, মঞ্জরী।

ওই একই কতা। ভারী তো মানুষ তার আবার নাম।

ও কথা ঠিক নয়। সব মানুষই ভগবানের সৃষ্টি। কিন্তু কই বললে না তো কেন শুধু বৈশাখ মাসেই তুলসী গাছে ঝারা দেয়; অন্য মাসে নয় কেন?

বাঃ। বোশেখ মাস যে তুলসীর মিত্যুমাস! সর্বদা জল না পেলেই শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাবে।—হি হি। পিসি এ কতা শুনে রেগে মরে। বলে, তোর যতো উন্‌চুটে কতা! বোশেখ মাস পুণ্যি মাস তাই ঝারার নিয়ম, নারায়ণের নিয়মসেবা! তো তারও মানে ভেবে রেকেচি আমি। বোশেখ মাস হলো গে নতুন গরমের মাস। ফল সরবৎ ডাব এ সব খাওয়ার দরকার। তা' ঠাকুরকে দিলেই মানুষের খাওয়া। ঠাকুরতো আর হি হি খেয়ে নেয় না। বরং ওই সময় গাচে গাচে যত ফলের সিষ্টি করে।

তুলসী।

কী হলো রাগ করলে না কি বাপু? আমি অমনি আলাত পালাত বকি।

না তুলসী, ভাবছি তোমার এতো বুদ্ধি তুমি যদি পড়া লেখা শিখতে।

ওমা! শোনো কতা মেয়েমানুষ নেকাপড়া শিকবে?

শেখে শেখে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। প্রাচীন-কালে অনেক বিদুষী নারী ছিলেন।

কি ছিলেন?

বিদুষী নারী! মানে বিদ্যেশেখা বিদ্বান পণ্ডিত মেয়ে। তাঁরা শাস্ত্র চর্চা করতেন। তুমি যদি বিদ্যা শিক্ষা করতে পেতে, তুমিও—

হুঁঃ। সে কতা বললে, তুলসীকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দেবে।—

তোমার ইচ্ছে হয় না?

ও কতা ছাড়ো ঠাকুর। মেয়েমানুষের আবার ইচ্ছে।

কিন্তু সব সময় কি এতো কথা বলার সময় থাকে?

নাঃ থাকে না।

তখন শুধু ছোট ছোট কথার ফুল্কি।

ঠাকুরমশাই ভাতটা দ্যাখো।

দেখেছি। দেখেছি। তোমার খালি ওই কথা।

বাবা। কী রাগ ঠাকুরের। বেশ এবার থেকে পুড়ে 'অঙার' হয়ে গেলেও বলচি না।

ঠাকুরমশাই আমার আস্ত নামটা তো জেনে গেছো, এই কাঠ কয়লার টুকরো দিয়ে দ্যালে লেকোতো দেকি, কেমন দেকতে লাগে।

কাঠকয়লা দিয়ে ?

তবে আবার কি দিয়ে ? উহুঁ না না, ত্যালে না। লোকে দেকলে কি ভাববে। আচ্ছা তুমি এই কাঠের পাটাখানার পিঠে লেকো। দেকি আমার নামটার কেমন ছাঁদ।

বৃন্দাবন চন্দ্রের—সন্ধ্যা আরতির সময় তুমি যাও না তুলসী ?

এক একদিন যাই পিসির সঙ্গে। ফুলদোলের দিনকে কি ঝুলনে, রাসে। ওই পালা পাব্বণে আর কি। যেতে তো মন চায়, তা পিসি যা কুনো। সাতজন্মে ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, এখোন আবার ঘরে সোনার গৌরাঙ্গকে এনে আরো কুনো হয়ে গ্যাচে। পথে বের করে না ছেলেকে, পাচে নজর লাগে।

তুমি কখনো মল্লিকবাবুর বাড়িতে গেছো ?

না।

কেন বলতো ? কী অপূর্ব বাগান কতো ফুল।

শোনো কতা। সব বড়মানুষের ই তো বাগান পুকুরের বাহার। তা বলে যেতে হবে ?

উনি তোমার পিসের মনিব।

পিসের। আমার তো না।

উনি লোক খুব ভালো।

ভালো তো কি হচ্চে। আমি কি কতা কইতে যাবো ? না দেকা করবো ?

আমি এতো ভালো লোক কখনো দেখিনি। দেখলে বুঝতে।

ভালো ভালো লোক দেকা কি আর মেয়েমানুষের ভাগ্যিতে হয় ঠাকুর ? আমাদের গাঁয়ে একজনা ছিলো, সে কেবল সাধু সন্নিসী দেকে বেড়াতো। একবার কানে এলো যদি অমুক জায়গায় এক সাধু এয়েচে

তো ছুট। কোতায় না কোতায় চললো। মেয়েমানুষের তেমন বাতিক থাকলে পাববে? হুঃ, দুয়ে অনেক তফাৎ। তা তুলসীর ভাগ্যিতে ঘরে বসেই দেকচে একজনা ভালো লোক।

তুলসী তোমার কাঁথা যে শেষ হচ্ছে না।

হবে হবে এবাবে শেষ হবে। কই পাটাখানা দাও তো। নিয়ে গে লুকিয়ে দেকি গে, নিজেব নামটা কেমন দেকতে।

এতো সব কথা কি কবে মনে ছিল কে জানে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে উঠছে।

আবো কত কথা।

খাওয়া নিয়েই বেশী। সকালে ছোলা গুড়েব বদলে চিঁড়ে মুড়কি ইয়ের প্রবর্তন কবতেই কি কম কথা?

।। সাত ।।

অবশেষে জামাইবাড়ি থেকে ফিরলেন বিন্দুবাসিনী। নাতনীর বিয়ের সত্যনারাণ, সুবচনী, অষ্টমঙ্গলা, সবকিছু মিটিয়ে তবে। আটকে থাকতে হয়েছিল তুলসীকেও। মুকুন্দ যে বরকন্যা বিদায়ের পরই চলে এসেছিলেন। তখন সে আসে কি করে? অতএব থাকতেই হল পিসির সঙ্গে।

কিন্তু তুলসী নামের মেয়েটা কি সত্যিই ওই বিয়ে বাড়িতে ছিল?

তা' ছিলই বলতে হবে।

সব অনুষ্ঠানেই তো তুলসী। করিৎকর্মা আর কথার জাহাজ এই মেয়েটা তো এই ক' দিন বোনাই বাড়িতেও বেশ পরিচিত হয়ে গেল। বিধবা নয়, পতি পরিত্যক্তা নয়, 'বাঁজা' বলে প্রচার করারও সুবিধে নেই! আরাম আয়েসের ঘাটতিতে নিজেই তেজ করে বরের বাড়ি থেকে চলে এসেছে। কাজেই তাকে 'অপয়া' বলা চলে না। বড়জোর 'ধিঙ্গী অবতার' বলা যায়। তাতে কি? ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচও তো দেখা যায় ঢের।—এ না হয় লম্বা ঘোমটা টানে না।

সবাই মিলেই তুলসীকে আটকাবার চেষ্টা করল।

পিসের অসুবিধে হবে এই ক্ষীণ চেষ্টাটুকু কোন কাজে লাগল না। স্বয়ং পিসেই ও কথা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিল।

তুলসী তাই সারাক্ষণ সকলের সঙ্গে। শুধু মাঝে মাঝে তুলসী অন্যত্র চলে যায়।—তুলসী রূপকথার গল্পের হিংসুটে সুয়োরানীর

হুয়োরানীর ফুলে মন্তরপড়া তেল মাখিয়ে তাকে পাখি করে উড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতিতে হঠাৎ হঠাৎ তুলসীমঞ্জুরা নামের মেয়েটার চুলে 'মন্তরপড়া' তেল মাখিয়ে তাকে 'পাখি' করে আকাশে উড়িয়ে দেয়। আর মন্তরের জোরেই আবার আকাশ থেকে নামিয়ে একটা পরিচিত দরজার সামনে বসিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে কথা বলায়।

'পাখি পড়ানো' বলে কথা। সে ঠিক বলে চলে, কী ঠাকুর, আছো কেমন ? কেউ বকব বকর করে জ্বালাতন করবার নেই, ভালোই আছো কী বলো ? খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে হরিমটর চালাচ্চো না তো ?

সংসারে যারা আচে, তাদের কতো হুঁশ তা তো জানা আচে।— আর তুমিও তো তেমনি আনাড়লো। তুমি কি আর বলবে, ওরে আমার হত্তুকি কুচি ফুরিয়ে গ্যাচে। সে আর তুমি বলেচ। বোধহয় তুলসী মঞ্জরী দাঁতে কেটেই। মুকশুদ্দি চালাচ্চো। তোমার তো তাও চলে। -দেকেচি তো পেবথম পেরণাম না কি, পোড়ারমুকি তুলসীর আস্ত নামটা জেনে ফেলে তুলসীমঞ্জরী বাদ ? আর ওকে দাঁতে কাটতে মন চাইবে না ?

হঠাৎ আবার হয়তো কিছুক্ষণ নীরব হয়ে যায় পাখিটা। আর সেই সঙ্গে নিথর হয়ে যায় চরাচর।

আবার কোনো সময় কথা কয়ে ওঠে, তেলের বটি বোধহয় শূন্যি হয়ে গ্যাছে ? পিদিপের অভাবে রাতের পুঁতিপাট বন্ধ ? অনেকটাই তো রেকে এযেছিলাম। তবে পাঁচ দিনের জায়গায় দশ দিন পার। আর সলতে শোলাকাটি চকমকি ? জানিনে, এখনো আচে কিনা। মনে পড়চে না কতগুলো ছিল। কতই না অসুবিদে হচ্ছে টের পাচ্চি সবই। কি করবো, মেয়েমানুষ জাত পরের অধীন। চোক থাকতে কানা, হাত থাকতে নুলো, পা থাকতে খোঁড়া।

কোনো এক সময় আবার পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা বুকে ভাবতে বসে সেই ঘরখানা খালি পড়ে নেই তো ? রান্না ঘরখানা হাঁ হাঁ করচে না তো ? ঘরপালানে বিবাগী মানুষটা আবার মনের খেয়ালে বিবাগী হয়ে যায়নি তো ?

ভাবতে বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে।

মনের ব্যবস্থা যে কি উল্টো-পাল্টা।

অবশেষে যখন শান্তিপুর থেকে নৌকো কাটোয়ার ঘাটে এসে থামল, এবং দেখা গেল মুকুন্দ সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিয় পাত্র শিবঠাকুর দাঁড়িয়ে তখনো আবার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়ই পড়তে লাগল।

বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে এসেছেন তাঁর সেজজামাই হরনাথ। শুধু যে নিয়ে আসবার লোকের অভাবে তা নয়, বিন্দুবাসিনীর নির্বন্ধাতিশয্যেই এসেছে।—জামাইরা ষষ্ঠিবাটায় আসে যায় নেমন্তন্ন খেয়ে ধুতি চাদর আর ধামা বোঝাই আম কাঁঠাল নৌকোয় উঠিয়ে নিয়ে বিদায় নেয়, শ্বশুরের কোথায় কি জমি জিরেত আছে অত দেখে না। জানেও না।

বিন্দুবাসিনী এবার টোপ ফেলেছেন।

নিজের চক্ষে একবার দেখে যাক হরনাথ, ছেলেকে যদি দত্তক দিতে রাজী হয়, কি পাবে তার ছেলে।

ছ'টা ছেলে আর তিনটে মেয়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলে দিদিমা দাদামশাইয়ের কাছে মানুষ হচ্ছে এটা অবশ্যই বেশ আরামের। আরো দুচারটেকেও যদি নিয়ে এসে খাওয়া মাখার সংসারে মানুষ করতে থাকেন, তাহলেও মন্দ হয় না। এই রকম একটা মনোভাব নিয়েই বসেছিল মেয়ে জামাই। এবং ভাব দেখাচ্ছিল (আপন আত্মীয় সমাজেই) আহা বুড়ো-বুড়ি দুটো একা পড়ে গেছে, তিনটে মেয়েই আপন আপন

সংসারের সংসারী। শূন্য সংসারের খাঁ খাঁ ভাব ঘোচাতে করুণা করেই তারা একটা ছেলেকে মায়ের কাছে দিয়ে রেখেছে।

কিন্তু মা যে মনে মনে আরো গুঢ় বাসনা পোষণ করছেন, সেটি ঠিক জানতো না। যেটি কাছ থেকে মানুষ হবে, সেটি অন্য নাতিদের থেকে বেশী পাবে থোবে, এইটিই জানা।—বড় নাতনীব বিয়েতে এসে বিন্দুবাসিনী যখন দেখলেন গোরাচাঁদ তাঁর মুখ বাখলো, তখন মনেব বাসনাটি মুখ দিয়ে বার করলেন।

শুনে সকলেই চমকালো।

এটা তো কেউ ভাবেনি। বিন্দুবাসিনী বিশেষ চতুরতার সঙ্গে সেই অভাবিত ব্যাপারটিই ক'দিনে চুপি চুপি সকলের কানে তুলে খবরটা গা-সহা করিয়ে নিলেন। চিরদিনের বোকা সোকা বিন্দুবাসিনী এ ব্যাপারে যে কি করে এতো চতুর হলেন, এই আশ্চর্য।

হয়তো স্বার্থসিদ্ধি আর বাসনা পুরণের বাসনায় এমনিই হয়।

বিয়ে বাড়ির সকলের কানে কানে আর চোখে চোখে খবরটা ফিরল।

আর সব মিটলে বিন্দুবাসিনী একবার সকলের সামনে মহামায়া আর তার বরকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সংকল্পটি ঘোষণা করলেন।

এই বছরের মধ্যেই একটা শুভোদিন দেখে পুষ্যি নেবো আমি সোনাব গৌরাঙ্গকে। সামনে এক বছর অকাল।

বললেন অবশ্য ঘোমটার মধ্যে থেকে একটা নাতনীর মাধ্যমে। কারণ দু' দুজন জামাই উপস্থিত। বড়জামাই তো বিন্দুবাসিনীব থেকে বয়েসে দু বছরের বড়।

সে যাক।

কথাটা সকলেরই শোনা হল। সাক্ষীও রইল।

শোনা কথাই, তবু সাক্ষী বেখে মত নেওয়া ভাল।

এ ব্যাপারে মুকুন্দর উপব কোনো আস্থা নেই বিন্দুবাসিনীর। বিশ্বাসও নয়। মুকুন্দ বিন্দুবাসিনীর এই তীব্র ইচ্ছার বিরোধী।

তিনি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন আগে একদিন, 'তিন মেয়ের দু'জনকে বঞ্চিত করে, একজনের সন্তানকে সর্বস্ব দেওয়াটাই কি ধর্ম হবে ? দত্তক নেয় নিঃসন্তান ব্যক্তি। আমরা তো তা নয়, কন্যা সন্তানও সন্তান।'

তখন শুধু বিন্দুবাসিনী আর মুকুন্দ।

অতএব লজ্জাশীলার ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বিন্দুবাসিনী জোর গলায় বলেছিলেন, কন্যে সন্তান জলপিণ্ডি দেবে ? সরকার বংশের ধারা রাকবে ?

মুকুন্দ বললেন, মুকুন্দ সরকারের বংশ এমন কিছু মান্যমানের নয় যে, ধারা বজায় না থাকলে বসুমতীর মহা ক্ষেতি হবে। আর জলপিণ্ড, সে তো দৌহিত্র সন্তান দিতেই পারে। পুঁটির ছেলে তো দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে, আজই যদি মরো জলপিণ্ডের অসুবিধে হবে না।

আজই মরচি এমন কতা কে বলেছে তোমায় ? তবে দৌত্তর সন্তান তো তে রাত্তিরে সারবে। সে আমাদের জন্যে কাচা গলায় দেবে ? ন্যাড়া হবে ?

তা' অবশ্য হবে না। পিতা বর্তমানে ওটা চলে না।

ষাট্ ষাট্ বালাই ষাট্! জামাইয়ের আমার একশো বছর পরমাই হোক। তবে পুষ্যিপুত্তুর করে নিলে তো আর সে দোষ লাগে না ? গোত্তরই তো বদলে গেল।

আরো অনেক বাকবিতণ্ডাই হয়েছিল।

অবশেষে বিন্দুবাসিনীই জয়ী হয়েছিলেন।

যুক্তিতে না হারলেও যুদ্ধে হেরেছিলেন মুকুন্দ। একগুঁয়ে বিন্দুবাসিনীর অশ্রুজলের আক্রমণে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন তিনি। চোখের জল সহ্য করতে পারেন না মুকুন্দ, সহ্য করতে পারেন না নাকের জল। ঘন ঘন নাকটানা, আর আঁচলে সে নাক মোছা বড় ভীতিকর।

আর বিন্দুবাসিনী সেই দৃশ্যেরই অবতারণা করে চলেছিলেন। যখন তখন। শেষ পর্যন্ত মুকুন্দ বলেছিলেন বেশ, যা ভাল বোঝো করো। ওদের মত নিতে হয় তুমি নিও। আমি পারবো না।

অতএব হাল ধরেছেন বিন্দুবাসিনী।

এক গলা ঘোমটার মধ্যে থেকেই ঝড় তুফান ঠেলছেন!

ঘোষণা সভায় অন্য সকলেই নীরব রইল, শুধু মহামায়া মলিন মুখে বলল, ও তো তোমারই হয়ে গ্যাচে মা। দেখলে তো আমায় পুঁচলোও না। তবে আর যগ্যি জানা করে নেওয়ার কী দরকার?

নটা ছেলেমেয়ে, আরও একটা আসন্ন। সর্বদাই তো মহামায়া ঝালাপালা হয়ে সেই 'আপদ বালাই'দের উদ্দেশ্যে বাক্য সুধা বর্ষণ করে। 'পঙ্গপাল! পঙ্গপাল!' আর কোনো চুলোয় ঠাঁই হয়নি, আমার ঘরে এসে ঢুকেচে। দুটো একটা মরেও রেহাই দেয় না তো। অ্যাতো মরণ ঘটচে পিথিবীতে, তোদের ক্যানো মরণ হয় না বল তো?

হামেসাই হরদম এই বাক্যবিন্যাস মহামায়ার।

কিন্তু ওরই মধ্যে একটা ছেলে, (যেটা চোখছাড়া হয়েই আছে) একেবারে পর হয়ে যাবে, নিঃসর্ত হয়ে দান করে ফেলতে হবে। ভেবে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো মহামায়ার। কদিন থেকেই উঠছে, তবু আশা ঝরছিল, সত্যি কি আর মা তা' বলতে পারবেন।

·দেখল, বলতে পারলেন।

তাই বলল, জন্মের শোদ পর হয়ে যাবে, ভেন্ন গোত্তরে গিয়ে পড়বে, এটাই ভেবে মনটা উথলোচ্ছে।

জামাইদের উপস্থিতি ভুলে বিন্দুবাসিনী মধ্যবর্তী মাধ্যমকে ছাড়লেন। সোজাসুজি উত্তর দিয়ে বসলেন, সেই গোত্তরে তুমিও একদা ছিলে মা। অ্যাখোন—অটা তোমার পর গোত্তর। তবে? মেয়ে সন্তানও সন্তান, তাকে ছাড়তে হয় না? 'দান' করে পরের করে দিয়ে দিতে হয় না জন্মের শোদ? তবে? মনে কর না গোরাচাঁদ তোমার ব্যাটা নয় বেটি।

'মনে কর'।

বলা যত সোজা, কাজে করা কি ততো সোজা ?

বাঙালী মায়ের হৃদয় জগতে ছেলে আর মেয়ের 'মূল্য' এক ?

মহামায়া ঘরের মেজেয় আঙুলের দাগ কাটতে কাটতে বলল, মনে করলেই কি হলো ? মেয়ে সন্তান পরের ঘরে যাবার জন্যেই। এটা চিরকেলে কতা। তাতে মন পোড়ে না।—আর ছেলে একটা গুণতিতে কমে গেল ভাবলে—

কথা শেষ করতে পারে না।

তা বিন্দুবাসিনীর ভগবান সহায়, ঠিক এই অবস্থায় মহামায়ার বর হরনাথ বলে ওঠে, কমে গেল ভাববার কিছু নেই। মায়ের কাছে রয়েছে ভাবলেই হল। আর ভগবান তো এখনো দিয়ে চলেছেন। মার যখন এত সাধ হয়েছে।

মহামায়া গুরুজনের উপস্থিতি ভুলে বলে ওঠে, তা তো বলবেই। মায়ের প্রাণ আব বাপের প্রাণে আকাশ পাতাল তফাৎ। বৎতিরিশ নাড়ি ছিঁড়ে তো জগতের আলো দেকাতে হয় না।

বড়জামাই গম্ভীর প্রকৃতি, তিনি চুপচাপই ছিলেন। হঠাৎ নিজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে বসেন, বড়বৌ, জিগ্যেস কর, হরনাথ না হয় ছেলেকে দিলেন, কিন্তু তৎপরে যদি শ্বশুর মশাইয়ের পুত্র সন্তান জন্মায় ? তখন ?

কী সর্বনাশ। এ আবার কী প্রশ্ন !

মরমে মরে গেলেন বিন্দুবাসিনী। সভাস্থ সকলের মধ্যেই একটি নীরব ছি ছি উঠল।

আর বড়বৌ অর্থাৎ পুঁটি ওরফে যোগমায়া বলে উঠল, কী কতার ছিরি। বাবার এখনো আবার—

আশ্চর্যের কিছু নেই। শ্বশুর ঠাকুরের বয়স মাত্র পঞ্চাশ। এ বয়েসে লোকে দ্বিতীয় তৃতীয়বার বিবাহ করে থাকে।

বাবার কথা হচ্ছে না।

যোগমায়া মুখ ঝামটা দিল, মায়ের বয়েসের হিসেব জানো ?

খুবই নির্লজ্জ কথা।

সভার মধ্যে এবং এই সব সম্পর্কের মধ্যে এমন নির্লজ্জ কথা উত্থাপন ভাবা যায় না। মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায় মহিলা কুলের। কিন্তু 'বিষয় সম্পত্তি' আর আইন, এরা এমনই বস্তু যে জগত সংসারের সর্বাধিক নির্লজ্জ ব্যাপারকে উদ্‌ঘাটিত করে ছাড়ে। বড় জামাই বিচক্ষণ আইন-কানুনের কিছু জানা আছে, তিনি ভায়রাভাইয়ের স্বার্থের দিকটা দেখবেন।

বিন্দুবাসিনী মরমে মরলেন। তবু শক্ত হাতে হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কাছে টেনে চুপি চুপি যা বললেন, মেয়ে তা ব্যক্ত করল!

সেই ব্যক্ত কথাটি হচ্ছে—

তেমন দুর্ঘটনা যদি ঘটে, দুকুড়ি বছর পার করে ফেলেও যদি তাঁকে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা থাকবে। আগে থেকেই সেভাবে দানপত্র করে দেওয়া হবে।

এরপর বড়মেয়ে আর ছোট মেয়ে নিজ নিজ রোষ প্রকাশ করল।

বিন্দুবাসিনীকে 'একচোখো' বলল, স্বার্থপর বলল, এতোগুলো নাতি থাকতে সবাইকে বঞ্চিত করে একজনকে 'রাজা' করে দেওয়ার বিরুদ্ধে অহিংস মন্তব্য করল, আবার সেই কথার পিঠে মহামায়াও বোনেদের 'চোখগুলো' হিংসুটে ইত্যাদি বলে নিতে ছাড়ল না। এবং তখনই হঠাৎ তার মা বাপের উপর দরদ উথলে উঠল।

সত্যিইতো মানুষের জলপিণ্ডির দরকার নেই? বংশের করণ কারণ, আচার নিয়ম সব কিছুর ধারা বজায় রাখার দরকার নেই? তিন মেয়ে তিন দিকে, ওনারা গত হলে ভিটে মাটি বিক্রি করে টাকাকড়ি ভাগ করে নেওয়া ছাড়া আর কী করবে মেয়েরা? তবে হ্যাঁ মহামায়ার মায়ের প্রাণ তাই মনটা মোচড় দিচ্ছিল। অবশ্য বাবা যখন এখানে

উপস্থিত নেই, একেবারে পাকা কথা হতে পারে না। এখুনি তো না। বছরের মধ্যেই তো? শুভোদিন একটা পাওয়া যাবেই। আপাতত মনস্থির করতে কিছুদিন সময় দিন মা!

হরনাথ অবশ্য মন স্থির করে ফেলেছিল। মুখে নির্লিপ্ত ভাব রাখছিল।

অতএব বিন্দুবাসিনী টোপ ফেললেন। বললেন, মেজজামাই আমায় কাটোয়ায় পৌঁচে দিন।

আমায় মানে আমাদের।

বিন্দুবাসিনী মানেই তুলসীমঞ্জরীও। যে নাকি জালে পড়া পাখির মত ছটফটাচ্ছিল এতোদিন।

মুকুন্দ বলেছিলেন, ওনারা আসবেন তো জামাইয়ের সঙ্গেই অবশ্য, তবে কেউ-একজন ঘাটে যাওয়া দরকার। আমি তো ওই পৌঁছে এসে পড়া দেখেই আবার নিজের কাজে নৌকোয় চাপবো। জগন্নাথ পারবি তোদের গিন্নীমাকে নিয়ে আসতে? জামাইবাবুর সঙ্গে আসা—কেউ না গেলে তার আবার মান থাকবে না।

সেই সময় শুক্ল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল, আমি গেলে দোষ আছে?

দোষ! দোষ কী হে? তবে তোমার কাজের ক্ষেতি হবে না? এখন তো আবার কাজ এখানে নিয়ে এসে টেনে তুলছ—

তাতে কিছু না।

শুক্ল স্পন্দিত হৃদয়ে বলেছিল, বিকেলের হাওয়ায় গঙ্গার দিকে তো যাওয়া হয়ে ওঠে না।

তা হলে ভালই হয়। চলো।

মুকুন্দ হৃষ্ট চিত্তে বেরিয়ে পড়েছিলেন। শুক্লকে সঙ্গে নিয়ে।

কিন্তু সেই দীপ্তমূর্তি যুবকের হৃদয় কন্দরেও তো ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

'মায়ের কথা' শোনা গেল। শোনা গেল, জামাইবাবুরও, কিন্তু তৃতীয় জনের কথা শোনা গেল না কেন?

সারা রাস্তা ঢেঁকির কত পাড়ই পড়ল। নিরবয়ব তাই, অবয়ব থাকলে কত ধান ভাঙা হয়ে যেত।

অবশেষে—

হ্যাঁ অবশেষে রাত্রিশেষে ঊষার উদয়ের মত, নৌকোর পাটাতন থেকেই একখানি মুখ ফুটে উঠল, মুহূর্তের অবগুণ্ঠন অপসারণে।

॥ আট ॥

বর্ষা পড়ে গেছে।

গ্রামের কাঁচাপথে কাদা। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ির চাকার দাগের কল্যাণে অবস্থা এমনই মনোরম যে চলতে চলতে হঠাৎ হাঁটু অবধি কাদায় বসে পড়ে।

মুকুন্দ সরকারের বাড়ি থেকে মল্লিক গৃহ বেশী দূর না হলেও, একটি মাঠ ভাঙতে হয়, এবং সেই মাঠটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়ে প্রায় ডোবার আকার ধারণ করে বর্ষাকালে। তা ছাড়া সরকার বাড়ির সামনে থেকেই সেই গোয়াল বিমর্দিত পথ।

সেদিন দেবনারায়ণ বললেন, শুক্লশিব, এই অসুবিধার মধ্যে নিত্য দু'বার যাতায়াত কষ্টকর। আমি বলি—তুমি কি আপাতত এখন তোমার পুঁথিপত্র মুকুন্দের গৃহে নিয়ে গিয়ে কাজ কর।

শুক্ল লাল হয়ে উঠে বলেছিল, না না আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। দরিদ্রের ঘরের ছেলে, হতভাগ্য ভাগ্য! আমার আবার কষ্ট!

দেবনারায়ণ হেসে বলেছিলেন, তোমার এই মনোভাবটি ভাল। কিন্তু আমার মতে ভাগ্য যখন যা হাতে তুলে দেয়, সেটিও নেওয়া উচিত। না নিলে ভাগ্য দেবতাকে ক্ষুব্ধ করা হয়।

এ কি বলছেন! এমন কথাতো কখনো—

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল শুক্লর।

দেবনারায়ণ বলেছিলেন, হয়তো শোনোনি। তা' সকলেরই তো কিছু কিছু নিজস্ব চিন্তাধারা থাকে। আমার মতে ভাগ্য মানেই

ভগবান। সবই তাঁর দেওয়া। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ যখন যা দেবেন মাথা পেতে নেওয়াই ভাল। এটা আমি তোমায় এই সামান্য ব্যাপারটির জন্যেই যা বলছি, তা নয়। তুমি বয়েসে তরুণ, আর আমার জীবনে দীর্ঘ বয়েসের অভিজ্ঞতা।—হয়তো ভাবছো লোকটা কাঠ কাটবার ব্যবসা করে খায়, এতো ধর্মকথা কেন?

আঃ, এ কী বলছেন?

ঠিকই বলছি বাপু। মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একটা কি কথা জানো? সংসারী লোকের বিষয়ী না হলে চলে না। কিন্তু মনের আরও একটা দিক তো থাকবে? যেখানে মানুষ নিজেকে 'মানুষ' বলে ভাবতে পারবে।—থাক এসব কথা, আলোচনা করতে গেলে অনেক। আপাতত তুমি অকারণ ক্লেশ গ্রহণ থেকে নিরস্ত হও বাপু। তোমার সরঞ্জামাদি নিয়ে গিয়ে গৃহে বসে কাজ কর। তা ছাড়া—

একটু থেমে বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য কাটোয়া থেকে চলে যেতে হবে আমায়—

অ্যাঁ! সে কি? কিছু দিনের জন্য! কো-থায়।

মাঝে মাঝেই কালনায় যান দেবনারায়ণ। তাঁর ব্যবসা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের জন্য অন্যত্রও যান, তবে দু'চার দিনের জন্যই মাত্র।

দেবনারায়ণ সংক্ষেপে জানালেন প্রথমে যাবেন শ্রীখণ্ডে, গুরুবাড়িতে। গুরুদেব বৃদ্ধ হয়েছেন, কবে আছেন কবে নেই। দেখা করার দরকার। তৎপরে কালনায় ছেলেদের সঙ্গেও প্রয়োজন।

শেষকালে হেসে বললেন, সেও ওই বিষয় ইত্যাদির জন্যই। অর্থমনর্থং, 'বিষয় বিষ'। লক্ষ্মীর বাহনই নিশাচর প্যাঁচা' এ সব জানা সত্ত্বেও ওই অর্থের পিছনেই ছোটাই তো মানুষের ধর্ম।

মানুষটি অদ্ভুত ধরনের।

একদিকে নির্জনতাবিলাসী, যার জন্য বছরের বেশী সময় পরিবার-বর্গের সঙ্গ ছেড়ে এই একক গৃহে এসে বাস করেন। আবার একদিকে খুব বাক্যবিলাসী। গল্প করতে বিশেষ ভালোবাসেন।

সে যাক।

তদবধি শুক্লশিবের বাড়িতেই স্থিতি!

এখন দেখছে, খুব ভাল প্রস্তাবই করেছিলেন দেবনারায়ণ।

শ্রাবণের অঝোর ধারা বর্ষণের সময় বাহিরের দিকে তাকিয়ে ভাবে, সত্যিই দু'বেলা যাতায়াতে শুধু ক্লেশই নয়, সময় নষ্টও হতো বিস্তর। এতো. প্রাতঃকাল থেকেই শুরু করে দেওয়া যায়। এবার তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। এরপর অন্য একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নকল করতে হবে। বলে রেখেছেন দেবনারায়ণ। গ্রন্থটি তিনি মেদিনীপুর জেলার এক ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে সংগ্রহ করেছেন। নাম 'গোবিন্দমঙ্গল'। লেখকের নাম পরিচয়ে উল্লেখ আছে 'দুঃখী শ্যামদাস' বলে। আসল নাম, না ছদ্মনাম তা জানার উপায় নেই। উপযুক্ত মূল্যে গ্রন্থটি তিনি কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজী হননি। দেবনারায়ণ আপন সংগ্রহের একটি মূল্যবান পুঁথি বন্ধক দিয়ে নিয়ে এসেছেন। এখন নিজে পাঠ করছেন। এরপর নকল করিয়ে নিয়ে ফেরৎ দেবেন।

এমনিতে স্বল্পবাক আবার মনোমতপ্রসঙ্গ এবং মনোমত শ্রোতা পেলে মনের দরজা খুলে বসেন দেবনারায়ণ।

শুক্লর মনে হয় চিরজীবন যদি এর কাছে থাকতে পাই।—

ধারা বর্ষণের মধ্যে একটা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে উঠোন পার হয়ে এসে দাওয়ায় উঠে দাঁড়াল তুলসী! এখানেও ছাট। কিন্তু সকাল থেকেই তো ঝরছে, থামবার নাম নেই। ঠাকুর কি খেলে না খেলে কিছুই জানা যাচ্ছে না।

জিগ্যেস করায় মোক্ষদা অবশ্য বলেছে, খেয়েছে গো খেয়েছে। তুমি ছিলে না বলে কি ঠাকুর অ্যাতো দিন উপুস করে ছেলো ? আমরা তো মরিনি। বাবুও তো রয়েচে। ময়রাবাড়ি বাবুর হুকুম দেওয়া ছেলো পিত্যদিন জোড়া জোড়া মণ্ডা নিয়েসে ঠাকুরের ঘরে রেকে যেত তিজেলভরে সরা চাপা দে।' পিঁপড়ের ভয়ে চৌকীতে হলুদ গুঁড়ো দে' থ্যতো কেষ্টর মা।

মোক্ষদার বাক্যবিন্যাসে যেন তুলসীর প্রতি ব্যঙ্গ ভাব।

কিন্তু কেন তা হবে ?

তুলসী ভেবেছে, কারণ তো নেই। ওর কথার ধরনই ওই। তবে যদি তুলসী না থাকায় শিবুঠাকুরের জন্যে দায়িত্ব পড়ায় রাগ হয়ে থাকে। মুখ্যু তো, বুঝবে কি করে অনেক' জন্মের ভাগ্যি থাকলেই তবে এমন ঠাকুরের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

টোকাটা দেয়াল ধারে ঠেকিয়ে রেখে তুলসী দরজায় দাঁড়াল।

ওমা ইকি। ঠাকুর নেকা ছেড়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিষ্টি দেকচে। গায়ে ছাট লাগচে খেয়াল নেই ?

ডেকে উঠতে ইতস্তত করতে করতেও ডেকে উঠল। ঠাকুর !

চট করে ঘুরে দাঁড়াল শুক্ল।

মুখটায় আলো জ্বলে উঠল।

তবু বলল, এ কী ! ভিজে ভিজে আসা কেন ?

ভিজিনি তো। টোকা মাতায় দিয়ে এয়েচি। তো গায়ে যে ছাট লাগচে। জানালাটা বন্দো করো।

অন্ধকার হয়ে যাচ্চে।

কেন ইদিকের জানালা ?

ওতে আলো আসে না।

তা'লে আজ নেকা বন্দো ?

না, বন্ধ কেন ? বৃষ্টিটা দেখতে খুব ভাল লাগছে, তাই দেখছি ,

ওমা, তোমারও আমার মতন দশা ! আমারও ছোট থেকে বিষ্টি দেকতে আহ্লাদ। যতো জোর হয় ততো মজা। অবিশ্যি কাজ কম্মের অসুবিদে, তা কি হবে।

তুলসী !

তুলসী প্রশ্ন করে না, একটু যেন অবাক হয়ে তাকায়। এমন করে ডাকল কেন।

শুক্র কাঁপা গলা সামলে নিল।

বলল, খুব নেমন্তন্ন খেলে দিদির বাড়ি, কেমন ?

এসেছে ক'দিন। কিন্তু কথা বলার তেমন সুবিধে হয়নি। হরনাথ ছিল, সর্বদা তা'র ফরমাস। আর এতো অসভ্য কথাবার্তা। কেবল 'শালি, শালি' বলে ডাক। দশ ছেলের বাপ হল, একটু ভার ভারিক্কী নেই।— আবার পিসির সামনে বলে কি না ভাইঝিটিকে একটু সাবধানে রাখবেন, বয়েস ভাল নয়, কে কখন দিষ্টি' দেবে।—

ছি ছি। কী ঘেন্নার কথা। ভাবে ভঙ্গীতে তো মনে হচ্ছে— তুইই দিষ্টি দিচ্ছিস।—ওসব মানুষের সামনে একা দাঁড়াতে ভয় করে। মনে হয়, সুবিধে পেলেই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আবার কত খোঁজ তল্লাস।

বরের বাড়ি কেন যায় না তুলসী, সতীন নেই এমন ভাগ্য কটা মেয়ের আছে ? এই তো যোগমায়ারই তো ছিল। মরেছে তাই।—

তোমাদের মেজদির অনেক ভাগ্যি তাই এমন সৎচরিত্র আদর্শ স্বামী পেয়েছে বুঝলে তুলসীরানী ? আমি তাকে বলি রোজ তোমার এই স্বামীর 'পাদোক' খাওয়া উচিত।

এ রকম কথা শুনলে তুলসীর মাথা জ্বলে যায়।

কিন্তু পিসি এখন সর্বদা জামাইয়ের তোয়াজে তৎপর। জামাইয়ের কাছ থেকে একবার তার ছেলেটা নিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত চলবে এমন তোয়াজ। এখন তো শাশুড়ী জামাইয়ে বেশ গল্প চলছে। আর জামাই যা বলে, তাতেই অমনি, 'তাইতো বাবা। ঠিকই তো বাবা। আপনি যা বলবেন সব সত্যি।'

আর ছেলেটি সর্বদা কোলটেপা। বাপ একদিন বলেছিল ওকে উঠোনে ছেড়ে দিন না হেঁটে বেড়াক। কেন কষ্ট করছেন?

বিন্দুবাসিনী আরো সট্টে পাট্টে ধরেছিলেন ছেলেকে। না না। কষ্ট কি। ছেড়ে দিলে হোঁচট খাবে, কি পায়ে তুন্সো ঘাস ফুটবে।

তবে ঠাকুর মশাইয়ের ব্যাপারে বিন্দুবাসিনী জামাইয়ের কথার একটু প্রতিবাদ না করে পারেননি।

পাজীটা বলেছিল, জমিদারের মাইনে করা লোক, জমিদারের বাড়িতেই থাকুক গে না। এখানে কেন? 'নিম্পর' একটা জোয়ান ছেলে—কখন কি মতি ঘটে—

বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি বলেছিলেন, না না, ও কথা বলবেন না বাবা। দেবতুল্য ছেলে। একদিকে ছেলে আর একদিকে খাঁটি সোনা ওজন করলে সোনা হেরে যাবে।

আর কিছু বলেনি পাজি।

কিন্তু মুচকে একটু হেসেছিল।

দেখে রাগে গা জ্বলে গেছল। তুলসীর।

যাক আপদ বিদেয় হয়েছে কাল। ওর জ্বালায় আর ওর ভয়েই আরো এদিক মাড়ায়নি তুলসী এসে পর্যন্ত।

তুলসী বলল, তা খেতে হল বৈ কি! মেয়েমানুষের তো সবই অপরের ইচ্ছেয়।

এখানের কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলে? অতো আমোদ আহ্লাদ হৈ চৈ।

তা তোমার যদি সেই বিশ্বাস জন্মে থাকে তো গিয়েছিলাম ভুলে।

শুক্র হেসে ফেলে।

তারপর বলে, বাড়িটা যে কী বিচ্ছিরি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

তুমি তো পুঁথি নিয়েই পড়ে থাকতে ঠাকুর। অতে খেয়াল হতো?

দেখো, এই একটা মজা দেখলাম। সময় পাই না বলেই পাঠ হয় না। কিন্তু এতো সময় পাচ্ছি তবু ঠিক তেমনটি হচ্ছে না।

কেন বাপু বকবকানি তুলসী তো ছিল না। মাতা ধরিয়ে দিতে।

শুক্র একটু হাসল।

বলল, হ্যাঁ সেই একটা সুবিধে ছিল বটে।

তারপর বলে উঠল, আচ্ছা তুলসী, তুমি আমায় 'ঠাকুর ঠাকুর' না বলে, ওদের মতো 'শিবুদাদা' বলতে পারো তো?

ওদের মতন? কাদের মতন?

তীক্ষ্ণ শোনালো তুলসীর গলা।—কি হল? কাদের মতন বললে না।

ওই আর কি—থতমত খায় শুক্র।

তুলসী বলে ওঠে, ওই মোক্ষদা, জগন্নাথ, কেষ্টর মা, গরুর রাখাল বেচা, ওদের মতন?

আহা তাই কি বলছি?

বলচোই! ওদের দলেই ফেলচো আমায়।

ছি ছি তুলসী। তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমি ঠিক সেরকম ভেবে বলিনি। 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' শুনতে কেমন লাগে। তাই।

ওই 'কেমন'ই শুনতে হবে। ওদের সঙ্গে গলার মিল করে 'শিবুদাদা' বলবে না তুলসী।- বাজে কথা থাক এখন খাওয়া দাওয়া হবে?—

একদিন না খেলে হয় না?

বাঃ বেশ ! একদিন ক্যানো দশ দিনও হতে পারে। সাধু-সন্তদের তো ক্ষিদে তেষ্টা লাগে না।

সাধুসন্ত আবার কে ?

এই তুমিই।—মেজ বোনাই বলছিল, এতো বড়ো ছেলে বে থা করেনি ? সাধুসন্ত হবে বুঝি ?

তোমার মেজ বোনাইয়ের কথা থাক। আজ কিন্তু সত্যিই 'পাক' করতে ইচ্ছে হচ্ছে না !

ক্যানো ? শরীর খারাপ না তো ?

না, না. তা' নয়। এমনি এই বর্ষার দিনে মুড়ি খেয়েও থাকা যায়। একটি শ্লোক মনে আসছে, সেটি লিখে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শোলোক তুমি নিজে লিকবে ?

দেখি।

লিকতে জানো ? কই কোনো দিন তো জানি না। বলোনি –

না, না, সে কিছুই হয় না।

না হোক আমি শুনবো।

আচ্ছা, এটি রচনা করে ফেলে দেখি শোনাবার যোগ্য কি না

তুলসী আস্তে বলে, তুলসীর কাচে আবার ওই কতা। তুমি নিকেচ, তুমি পড়ে শোনাবে, এইতেই বত্তে যাবে মুকপুড়ি তুলসী। তাব কাচে আবার যুগ্যি অযুগ্যি।

।। নয় ।।

পুঁথি নকল করে ?

গুরুদেব একটু চমকে উঠলেন।

তারপর বললেন, বলছো যে পিতামাতা, ভাইবন্ধু, আত্মীয়, সমাজ কিছুই নাই। ভিটাবাড়িও নাই। তা ছাড়া ওই পুঁথি নকল তুমি কি একে উমারানীর উপযুক্ত পাত্র বলে মনে কর বাবা দেবনারায়ণ ?

দেবনারায়ণ আহত হল না।

এ প্রস্তুতি ছিলই মনের মধ্যে।

তাই দৃঢ় গলায় বললেন, হ্যাঁ গুরুদেব ! মনে করছি।—যদি সেই যুবককে দেখতেন, তা হলে আপনিও মনে করতেন। যেমন দেবদুর্লভ কান্তি, তেমনি—

কান্তিটাই তো সব নয় বাপু। কুলশীল দেখতে হবে তো ?

কুল অতি উচ্চ। আমি সংবাদ না নিয়ে আসি নাই। আর শীল ? সে তো ব্যবহারেই প্রমাণিত। সেও অতি উচ্চমানের। দারিদ্র্যের জ্বালায় পুঁথি নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে। সুযোগ পেলে রীতিমত পণ্ডিত হতে পারতো। তৎসত্ত্বেও ওই দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনেও যা পড়াশুনো করেছে, তা' ধনী ঘরের ছেলে বহু সুযোগ সত্ত্বেও পারে না।—আমি ঘটক নই গুরুদেব, ছেলেটি একটি মূল্যবান রত্ন বলেই আপনার কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।—মনে হচ্ছে উমারানীর জন্যে আপনি তো চিন্তিতই আছেন—

তা' আছি বৈ কি বাবা—

গুরুদেব তাড়াতাড়ি স্বর কোমল করে বললেন, যার দায় সে তো আমার মাথায় সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে, এখন ভরসা তোমরাই। তুমি যখন বিবেচনা করছো, সে ছেলে উমারানীর উপযুক্ত পাত্র তখন আমার কিছু দ্বিধার নাই, কিন্তু চিন্তা এই বধূমাতা যদি ক্ষুব্ধ হন। যদি ভাবেন, উমারানী পিতৃহীনা বলেই, তার ভাগ্যে এমন বিবাহ হল। 'ঠাকুর' দেখলেন শুনলেন না একটা চাল চুলোহীন পাত্র ধরে—

দেবনারায়ণ আস্তে বললেন, নিজেকে আমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলিরই সম্মুখীন করেছি গুরুদেব, তৎসত্ত্বেও বলছি। ছেলেটি যদি আমার স্বজাতি হতো, তা' হলে যেভাবেই হোক আত্মীয় করে নিয়ে নিতাম। ওইখানেই যে অসুবিধা। তবে এটি যদি আমাদের অবহেলায় অন্য কোথাও চলে যায়, আপশোসের শেষ থাকবে না।—আমি বলছি গুরুদেব শুক্লশিব একটি রত্নস্বরূপ।

কি নাম বললে ?

শুক্লশিব ? শুক্লশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুদেব বললেন, বধূমাতাকে একটু প্রশ্ন কবি দেবনারায়ণ। বাড়ির মধ্যে ঘুরে আসি।

একটু হাসলেন দেবনারায়ণ, বধূমাতা কি আপনার সামনে নিজ মত ব্যক্ত করবেন ? না আপনার বিবেচনার উপব ইচ্ছা চালাবেন ?

তবু—

গুরুদেবের বয়েস হয়েছে, আস্তে আস্তে ওঠেন।

দেবনারায়ণ ভাবলেন, এই হচ্ছে ঔষধ প্রয়োগের সুযোগ।

আস্তেই বললেন, বধূমাতাকে একটি কথা জানাবেন, মেয়েকে বেশী দূরে পাঠাতে হবে না, কাটোয়াতেই থাকতে পাবে।—আমার কাটোয়ার বাড়ি, বাগান, পুকুর মায় জমি জমা ইত্যাদি সবই আমি গুরুদেবের পৌত্রীকে বিবাহেব যৌতুকস্বরূপ উপহার দেব।

অ্যাঁ !

গুরুদেব ভিতর বাড়িতে যেতে গিয়ে থমকে প্রায় টলে পড়া অবস্থায় কপাটের কাঠ চেপে ধরে বললেন, কী বলছো দেবনারায়ণ ?

হ্যাঁ, গুরুদেব, এই আমার ইচ্ছা। উমারানী পিতৃহীনা, আমি তার জ্যেষ্ঠতাত তুল্য, তার বিবাহে কিছু যৌতুক তো অবশ্যই দিতাম। এই শুক্লশিবও। আমার চিত্তলোকে প্রায় পুত্রতুল্য। তাকেও বিবাহ সংস্কার করিয়ে, একটি নিশ্চিন্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। গুরুদেব জীবিকা নির্বাহের দায় না থাকলে সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে, শাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারবে, ভবিষ্যতে হয়তো কিন্তু থাক ভবিষ্যতের কথা বেশী চিন্তায় কাজ নেই। তবে ওই যুবকটির যদি ওকে পুঁথি নকল করে জীবন কাটাতে হয়, সেটা সমাজের একটা লোকসান।

গুরুদেব বললেন, তোমার কথা আমি অনুধাবন করছি দেবনারায়ণ। কিন্তু তোমার পুত্ররা এতে অসন্তুষ্ট হতে পারে তো ?

পুত্রেরা ?

দেবনারায়ণ একটু হেসে বললেন, গুরুদেব, দারাপুত্রকে সন্তুষ্ট রাখতে কে কবে পেরেছে ?

গুরুদেবও ঈষৎ হাসলেন।

অতঃপর বললেন, সেটা অবশ্যই। সম্পর্কটা চিরদিনই থাকত আর মহাজনের। তবে অনেকটা সম্পত্তি অপরকে দান করলে তাদের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক।

তা' স্বাভাবিক বটে।

দেবনারায়ণ বললেন, আপনাকে আর আমি কি বোঝাবো, ওটা তো মানব ধর্ম। ঈর্ষাই মানবের প্রধান ধর্ম। ও নিয়ে চিন্তা করতে গেলে চলে না।—আমার পুত্রদের আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন গৃহী সংসারীর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সংস্থান করে দিয়েছি। সবই আপনার অধম শিষ্যের স্বোপার্জিত অর্থে। তা ছাড়া কালনার জমিদারী তো রয়েইছে। এতেও যদি তারা আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ঈর্ষার দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে, আমি নাচার। তবে জানাবো একবার তাদের। এখন আপনার অভিমত জানতে পারলেই—

কিন্তু আর কি সন্দেহ আছে অভিমত সম্পর্কে ? গুরুদেব দেবনারায়ণের কাটোয়ার গৃহে দু' একবার এসেছেন। একবার গুরুপত্নী ও পরিবারের সকলকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন দেবনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ পৌত্রের 'বিদ্যারম্ভ' উপলক্ষে। ঘটাটা ওইখানেই করবেন বলেই তেমন আয়োজন। উৎসবের একটা উপলক্ষ তো চাই। মাঝে মাঝে উৎসবই তো গতানুগতিক জীবন ধারার স্তিমিত ধারায় গতিবেগের সঞ্চারক।

অতএব জন্ম মৃত্যু বিবাহকে কেন্দ্র করে যতভাবে সম্ভব, উৎসব অনুষ্ঠানের প্রবর্তন।—তা' ছাড়া—নিত্য উৎসবের ধারক বাহক বিগ্রহকুল তো আছেনই।

ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হয়ে চলেছে, সেই পারমার্থিক উৎসবের বহতা নদী।

॥ দশ ॥

কালনার বাড়িতে এবার অনেক দিন পরে এলেন দেবনারায়ণ। বৃহৎ তিনমহলা প্রাসাদ।

এ প্রাসাদ পিতামহের নির্মিত।

বিরাট লোহার গেটের মাঝখানে একটি কাটা দরজা সর্বদা ব্যবহারের জন্য সদা উন্মুক্ত। বিশেষ দিনে, বা বিশেষ কারো আগমনে সবটা খোলা হয়, দু'জন দারোয়ান ঠেলে ঠেলে সেই গেটকে সবটা খুলে ধরলো দেবনারায়ণের জন্য।

বাড়ির মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। গৃহিণীহীন গৃহে যার পুত্রবধুই গৃহিণী, তবু দায়দায়িত্ব জ্যেষ্ঠেরই বেশী। সেই সর্বাধিক তৎপর হয়ে উঠল। দেবনারায়ণ গেট পার হয়ে কাঁকর ঢালা পথটা দিয়ে বৈঠকখানা বাড়ির সিঁড়িতে উঠলেন।

কয়েকটি ধাপ উঠেই বৃহৎ হল। ভিতরে ফরাস।

দেবনারায়ণের মনে হল সবই যেন মলিন জীর্ণ শ্রীহীন।—শৈশবের স্মৃতিটা মনে পড়ল। তখন কত ঝকঝকে চকচকে।

একপুরুষের নির্মিত গৃহ যদি তিনপুরুষে নিশ্চিন্ত চিত্তে বাস করতে থাকে। গৃহ সংস্কারের দায়িত্ব অনুভব করে না, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না, তা হলে এই রকমই হয়। গতবার ছেলেদের

এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার কথা বলে অর্থের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন, কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

যাক পরে কথাবার্তা হবে।

বৈঠকখানা বাটির পিছনেও সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে পড়লেই, ডানদিকে একদার লোকজনের মহল, বাঁদিকে একদার কাছারি-বাড়ি। এখন এসব নিষ্প্রভ।

এরপরই একটি বৃহৎ লোহার দরজা, যাব ওপারে অন্দর মহল। এইখানে পড়লেই লোহার দরজার মুখোমুখি 'ঠাকুরদালান।' তার ধারে পাশে ভোগের ঘর, নৈবেদ্যের ঘর, ডাব নারকেল বোঝাই রাখবার ঘর। সবই ধূলিমলিন।

দেবনারায়ণের খেয়াল হল, তিনি এবার আগে থাকতে খবর দিয়ে আসেননি। হঠাৎ এসে পড়েছেন। তাই অবস্থা অপ্রস্তুত। যাক, ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে কপাল ঠেকিয়ে একটি প্রণাম সেবে তার পাশের একটি চলন ঘর পার হয়ে দ্বিতলের সিঁড়িতে উঠে গেলেন। -

চার ছেলে চার বৌ অনেকগুলি নাতি-নাতনী জলযোগান্তে তাদের সব কুশলবার্তা নেবার পর কথাটা পাড়লেন দেবনারায়ণ।

শুনে ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

আর গুণ্ঠনবতীরা গুণ্ঠনের আড়ালে চঞ্চল হয়ে উঠল।

কাটোয়ার উদ্যানবাটিটি সকলের দেখেছে। স্বপ্নেও ভাবেনি কোনো দিন তার এমন পরিণতি ঘটতে পারে।

একটু পরে বড়ছেলে দিব্যনারায়ণ গম্ভীরভাবে বললো, আপনার জিনিস, আপনি আপনার ইচ্ছামত কাজ করবেন এতে আমাদের কি বলার আছে ?

হ্যাঁ, নিজের মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করে দেবনারায়ণ বলেছিলেন, আমার তো এই ইচ্ছা, এখন তোমরা কি বল ?

এটা তারই উত্তর।

দেবনারায়ণ মৃদু হেসে বললেন, সে তো সত্য, তবু তোমরা প্রসন্ন চিত্তে সমর্থন করলে আমার মনে নিশ্চিন্ততা থাকে।

এ কথায় ছোট ছেলে সুন্দর নারায়ণ বলে উঠলো, প্রসন্নচিত্তে আর আর সম্ভব হয় কি করে ? কাটোয়ার বাড়ির সৌন্দর্য আলাদা, তা ছাড়া নবনির্মিত। সেটি আমাদের থাকবে না, ভেবে মনটা তো বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছেই।

দেবনারায়ণ বললেন, এই কালনার আশে পাশেই তোমাদের চার ভাইয়ের জন্যে যে চারখানি গৃহ নির্মাণ করিয়েছি, সেও প্রায় কাটোয়ার গৃহেরই নক্সায় প্রস্তুত। অবশ্য উদ্যান নেই। কিন্তু সংলগ্ন জমির অভাব নেই, নিজ নিজ পছন্দ মত করেও নিতে পারো। এখন যতদিন পিতৃপুরুষের ভিটেয় স্বচ্ছন্দে সুস্থ চিত্তে থাকতে পারো, থাকবে। ভাগ্যে থাকবে লোকে তো কত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, তীর্থস্থানে ধর্মশালা গড়ে দেয়, তোমাদের পিতা না হয় গুরুর পিতৃহীনা পৌত্রীর নামে এক খণ্ড সম্পত্তি উৎসর্গ করল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এতে তোমাদের কমে যাবে না। জানো তো—তোমাদের জননী বলতেন, 'মনের গুণে ধন'। আর বলতেন -ভগবান বলেন, 'দেব ধন দেখব মন! কেড়ে নিতে কতক্ষণ' ?—দানের অর্থের সার্থকতা, এবং সম্প্রসারণও তোমার সিন্দুকে

যদি সোনার তাল জমানো থাকে কোনো দিন কোনো কাজে লাগানো না হয়, মাটির তালের সঙ্গে তফাৎ কি বল ?

ছেলেরা ঘাড় হেঁট করে বসেছিল, এখন বলল, ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছামতই কাজ হবে। গুরুদেবেরও আনন্দবর্ধন হবে।

দেবনারায়ণ আবার হাসলেন। বললেন, ওইতো মানব হৃদয়ের রহস্য। সাধু সন্ন্যাসী গুরু পুরোহিত, প্রাপ্তিতে সকলেই প্রসন্ন।— তোমরা বিষণ্ণ বোধ কোরো না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমাদের অনেক হবে।

কিন্তু মনে মনে বললেন, কোথা থেকে তাই ভাবনা। একজনও তো আঙুলটি নাড়তে চাও না। আমার এই ব্যবসায় কর্মচারীর উপর কর্মচারীই নিয়োগ করে চলেছি। তোমাদের একজনেরও সাহায্য পাই না। 'আমরা কিছু বুঝি না' বলে গা ঝাড়া দিয়ে চলো আর তাস পাশা নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দাও। কিছু বোঝো না কিন্তু ব্যবসায় লব্ধ অর্থটি তো ভালই বোঝো বাপু। এবং পিতৃ সম্পত্তিতে যে ছেলেদের ষোলো আনা দাবী, সেটিও বোঝো। যাক আমার মৃত্যুর পর কার কী হবে, ও নিয়ে এখন আর ভাবি না।—হ্যাঁ আগে ভেবেছি, তদুপযুক্ত ব্যবস্থাও করেছি। কন্যাদেরও যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ দিয়েছি যৌতুকস্বরূপ। এখন বুঝতে পারি ওই ভাবনার মত মুর্খ্যমি আর নেই। মৃত্যুর পর কে কার পুত্র, কে কার কন্যা, কে কার আত্মীয়জন।

একটু পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন, যাই একবার দক্ষিণাকালীর মন্দির দর্শন করে আসি। বৌমারা, শ্বশুরকে কি খাওয়াবেন গো ? ঈশান ঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে জিভ তো অসাড় হয়ে আছে। মেজবৌমা, আপনার সেই বড়ির ঝালটা ভুলে যাননি তো ?

শ্বশুরের সঙ্গে কথা কওয়া বিধি নয়, বৌমারা উত্তর দেবেন না, তবে আদেশ পালন হবে। কিন্তু এইটা কি একটা ভাল রান্না? তুচ্ছ বড়ির ঝাল?

আসলে আবহাওয়া হালকা করতেই দেবনারায়ণের এই হালকা রান্নার আবদার।

'শোলোক' শুনতে এসে তুলসী দেখল, শুক্র গায়ে একটা মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পুঁথি লিখছে। এ দৃশ্য বিরল। চমকে বলল, অসুখ করেনি তো ঠাকুর?

শুক্র বলল, না না! অসুখ করবে কেন?

অসুখ কি আর 'ক্যানো' মানে? ওবেলা জলের ছাট লাগালে কতোক্ষণ কে জানে।

ওতে কিছু হয় না। বাতাসটা জোলো বইছে, তাই এটা গায়ে দিয়েছি।

সে বুদ্ধিও যে হয়েচে, মঙ্গল। ওবেলা আবার পাকও করলে না। তাই ভাবনা হচ্চে।

বাঃ, পাক করলাম না তো শ্লোক লিখবো বলে।

নেকা হয়েচে?

তুলসীর চিন্তিত চোখ মুখ নেচে ওঠে।

ওই লিখলাম একটা। কৃত্তিবাসী পয়ারের ছন্দে।

কৃত্তিবাসী কথাটা বোঝে তুলসী। কোথাও রামায়ণ গান হলে বিন্দুবাসিনী শুনতে যান পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে। তুলসীও যতদিন এসেছে, যায় ওঁর সঙ্গে।—এখানে মুকুন্দ বহিরাগত জ্ঞাতি গোত্র নেই, যা ভাব ভালবাসা ওই পাড়া পড়শীর সঙ্গে।

খুব ভাল লোক মুকুন্দ।

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এসেছিলেন আদি গ্রাম থেকে। হয়তো ব্যবসার প্রতি একাত্মতাবোধের সেটা একটা কারণ।

কই শোনাও ?

ভাল হয়নি তেমন কিছু।

ভনিতে রাখো, পড়ো তো।

কাজের তাডা আছে বুঝি ?

না। শোনার তাড়া হচ্চে।

চৌকাঠ চেপে বসে তুলসী। ঘবেব মধ্যে ঢোকে না কখনো।

কুলুঙ্গী থেকে কয়েকখানি তালপাতা পেড়ে এনে. তা থেকে ছুটি বেছে নিয়ে চৌকীর উপর বিছিয়ে ধবে শুক্র। আস্তে মেলে ধবে ধীবে ধীরে পড়ে।

অগ্রে বন্দি নারায়ণ তিনলোকপতি।
অতঃপর বন্দি তোমা-মাতা সরস্বতী॥
অভাগা সন্তান প্রতি কত কৃপা তব।
ঢালিছ হবষধারা সদা নব নব॥
মহাজনগণ যত রচেছেন গান।
সেই সুধারস পানে ভবি ওঠে প্রাণ॥
শ্রীচরণে তাই মাগো আকুল প্রার্থনা।
এ সন্তানে দাও শক্তি করিতে রচনা॥
পারো যদি তরাইতে দস্যু রত্নাকরে।
অবশ্য তরাতে পারো এই অধমেরে॥
পুনঃ কোটি নমস্কার চরণে তোমার।
নিবেদন মম পুনঃ রাখি বার বার॥
ঠাঁই যেন পাই তব কমল কাননে।
'কবি' বলে পরিচয় দিবে নরগণে॥

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে অভিভূত তুলসী বলে, নিজে নিকেচো ?

সেই তো তখন।

আর এই তোমাকে আমি কত ব্যস্ত করি। কত আলাত পালাত বকি বসে বসে। কোতায় তুমি, আর কোতায় আমি।

শুক্ল তাড়াতাড়ি বলে, ওকথা বোলোনা তুলসী। তুমি আছো, তাই আমি—এই এই আবার বৃষ্টি এলো।

দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি।

পাতা দুখানা হাওয়ায় উড়ে মাটিতে পড়ল। নীচু হয়ে তুলে নিয়ে শুক্ল একটু হেসে বলল, দেখলে তো আমার রচনার দশা ? ভগবান বুঝিয়ে দিলেন। যাও যাও, পালাও। উঠোনে নামতে পারবে না পরে।

তুলসী চলে যেতেই কপাটটাও বন্ধ করে দিল শুক্ল।

বেশ শীত করছে, বুকের মধ্যে যেন গুর গুর করছে। জ্বর জ্বালা হবে না তো ? এ আবার কী বিপদ। মা সরস্বতী কোনো অপরাধ নিলেন না তো। হাতের কাছে কম্বল টম্বল না পেয়ে তলায় পাতা তোষোকখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে কাঁপতে লাগল।

রুগীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। দেখছেন তো।

গঙ্গা কবিরাজ বললেন, ভীতির কোনো কারণ নাই। শ্লেষ্মাজনিত জ্বর। বর্ষাকালে ঘরে ঘরে এরূপ জ্বর দেখা যাচ্ছে। তবে সাবধানে রাখা দরকার। সামান্য শ্লেষ্মাই। সান্নিপাতিক হতে কতক্ষণ ?

ব্যাকুল মুকুন্দ কাতর ভাবে বললেন, যা করতে হবে করব। নির্দেশ দিন। এই সময়ই আবার বাবু এখানে নেই। এই যুবক এতো দিন রয়েছে আমার গৃহে কোনোদিন কোনো অসুখ হতে দেখি নাই।

শামুকের খোল থেকে নস্য বার করে নিয়ে নাকে দিয়ে গঙ্গা কবরেজ বললেন. কখনো হয় নাই বলে কি কখনো হবে না ? শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্। যাক ঔষধপত্র দিয়ে গেলাম। অনুপানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মানবেন। আর একটা কথা। এই কক্ষটি বদল করলে ভাল হয়।

কক্ষটি বদল।

হ্যাঁ। পারলে উত্তম। এ কক্ষ সহজ মানুষের পক্ষে ভালো, কিন্তু কপাট খুললেই বৃষ্টির ছাট প্রবেশ করছে। খোলা দাওয়ার উপর তো। যদি দালানের ভিতর রাখা সম্ভব হয় ভালো হয়। বয়েসটা ভাল নয়, সান্নিপাতিক ধরে গেলে মুস্কিল। উত্তাপটা লক্ষ্য কববেন।

ভীতির কোনো কারণ নেই বলেও এই কথাগুলি বলে গেলেন কবিরাজ।

বিপন্ন মুকুন্দ বিন্দুবাসিনীকে কথাটা জানাতেই বিন্দুবাসিনী শিউরে উঠে বললেন, বল কি ? যদি জ্বব বিকাব হয় ? সে যে বড় ছোঁয়াচ ব্যাধি! আমাব সোনাব গৌরাঙ্গকে নিযে কোথায সবে নড়ে যাব আমি ?

মুকুন্দ বিরক্ত হলেন। বললেন, গোড়াতেই কু গাইছো কেন ? বললাম তো কবরেজ মশাই বলেছেন, ভয়ের কারণ নেই, তবে সাবধানে বাখতে হবে। ওই ঘবটা ঠাণ্ডা। ঘর বদলের দরকার।

বিন্দুবাসিনী বিমূঢ় ভাবে বললেন সেটা কি করে হবে ?

হবে না কেন ? বাড়িতে ঘরের অভাব আছে ? ভিতর দালানের মধ্যে কোনো ঘরে নিয়ে আসতে হবে। সবই তো পড়ে আছে। মেয়েরা যবে আসে. তখন কাজে লাগে। সে যাক, ওই ব্যবস্থাই করছি।

বিন্দুবাসিনী প্রধান অস্ত্র ছুঁড়লেন। ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বললেন, তার মানে হচ্ছে ছোঁয়াচে আরো কাচে ডেকে আনবে? আমি থাকব না, কখ্যানো থাকব না। গৌরাঙ্গচাঁদকে নিয়ে পালিয়ে যাবো।

কোথায় যাবে? মুকুন্দর স্বর জলদ-গম্ভীর।

হেতায় সেতায় সেতায় হোক। পড়শীর ঘরে গিয়ে উটবো।—অ্যাখনো গোরা অপরের ছেলে তা' মানো তো? যদি রোগ ব্যাধি হয়, তারা আর আমায় দেবে ছেলে?

মুকুন্দ একটা নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, এই একটা বাতিক করে তুমি পুরো পাগল হয়ে যাচ্ছো পুঁটির মা। ভগবান তো একটা ছেলের মত ছেলে, তৈরী ছেলে অযাচিত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাকেই সন্তান বলে মনে করতে পারতে। তা' পারলে না। মেয়েদের পার করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন হয়েছিল। বেঁচে গিয়ে স্বাধীনতায় থাকতে পারছিলে—তাও খোয়ালে স্বেচ্ছায়। ঝঞ্ঝাট ডেকে এনে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছো। আমাকেও জব্দ করছো। আশ্চর্য বাতিক।

বিন্দুবাসিনী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, শিবুকে আমি মায়া মমতা করি না?

যা করো তা তো দেখতেই পেলাম। যাক্ ওনিয়ে কথা থাক, তবে ভেবে দেখো, তুমি যদি পড়শী বাড়ি গিয়ে বসে থাকো শিবুর সেবা যত্নর কী হবে?

বিন্দুবাসিনী বললেন, আমি কি সাদ করে বলচি? গোরাচাঁদের জন্যেই বলচি। সংসারে সবাই তো রয়েচে। তুমি জগন্নাথ, রাখোহরি, মোক্ষদা, কেষ্টর মা, তুলসী। তুলসী তো রুগীর সেবায় খুব দড়।

মুকুন্দ বললেন, তোমার যদি সহজ বুদ্ধি থাকতো, একথা বলতে না। একটা অনাত্মীয় যুবক ছেলের রোগে, একটা যুবতী মেয়ে সেবা করতে বসবে, এটা ন্যায্য? লোকে বলবে কি? ঠিক আছে তুমি যা ভাল বোঝো করো। আমি যা বুঝি করছি। মল্লিক মশাই এই সময় বারানসী গিয়ে বসে থাকলেন—

যে যা ভাল বুঝল তাই করল।

বিন্দুবাসিনী গোরাচাঁদকে নিয়ে পাড়ার এক সখীর বাড়ি গিয়ে বসে রইলেন, মুকুন্দ নিজে রাত্রে থাকেন। এবং দিনে জগন্নাথ মোক্ষদা ও কেষ্টর মাকে দিয়ে পালা করে সেবা চালাতে লাগলেন। তুলসী রইল অনুপান ও পথ্যের জোগান দিতে।

মাথার কাছে বসে অনুক্ষণ পাখার বাতাস দেবার ভার মোক্ষদার। জলপটি শুকিয়ে উঠলেই ভিজিয়ে দেওয়াও তার কাজ।

তুলসী ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়, ভিতরে ঢুকতে সাহস করে না। মোক্ষদার ওপর যেন হিংসে হয় তুলসীর।

তবে ভাগ্য এই ঔষধ পথ্যের ভার মুকুন্দ তার উপরই দিয়েছেন, ওদের উপর আস্থা রাখেন নি।

সময় ফুরোয় না তুলসীর।

মাঝে মাঝেই শুক্রর পরিত্যক্ত ঘরখানা ঝাড়া মোছার ছুতোয় এসে ঢোকে। শুক্র থাকতে কোনদিন ভিতরে ঢোকেনি, যা কিছু কথা দরজার বাইরে থেকে। রান্নাঘরের দরজাতেই প্রধান। এ ঘরে ঢুকে এলে গা ছম ছম করে। তবু এই দিকেই মন টানে। কে যেন সবলে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে আসে এ ঘরে তুলসীকে।

॥ এগার ॥

শিবু ঠাকুরের নেকার ঘরে তুলসী দিদি য্যাখন ত্যাখন কী করে রে মোক্ষদা ?

ভগবান জানে। এ ঘরে ঢুকতে পায় না তাই ও ঘরে বসেও সুখ। পুরুষঘেঁষা মেয়েমানুষের যা স্বভাব।

এ ঘরে ঢুকতে পেলে কি আর নড়তো ? আহার নিদ্রে ছেড়ে এখেনেই পড়ে থাকতো, দোরে এসে য্যাতোখোন দাঁড়িয়ে থাকে। ত্যাখনকার চোক দুটো দেকেচিস মোক্ষদা ?

দেকেচি বৈ কি কেষ্টর মা। যেন চোক দে গিনে খাবে মানুষটাকে। আহা ভালমানুষ বামুনের ছেলেটাকে এই ঢলানিই নষ্ট করে ছাড়বে, এই আমি তোমায় বলে রাকচি।

গিন্নীকেও বলিহারী ! চোক চেয়ে একবার দেকে না। অ্যাখোন তো আবার বাড়ি ছাড়া হয়ে বসে আচে। য্যাখন থাকে ত্যাখনও চোক বোজা ! নাতি নিয়েই মত্ত।

দেকৃতো। যদি কত্তার ভাইঝি হোতো। পাঁশ পেড়ে কাটতো, এ যে নিজের ভাইঝি। তাই সাত খুন মাপ।

একটা মেয়ের সম্পর্কে আড়ালে আবডালে অহরহ এই আলোচনা দুটো মেয়েমানুষের। মেয়েরাই তো মেয়েদের শত্রু। তারাই তো অবিশ্বাস করে বেশী। পুরুষের 'দৃষ্টি' প্রখর নয়, এবং 'বোধশক্তি'ও প্রবল নয়। সাধারণত পুরুষের মন রক্ষণশীল, তাই সে সামাজিক চোখ নিয়ে ন্যায্য অন্যায্য বিচার করে। এই মাত্র।

প্রখর সূক্ষ্ম কোনো দৃষ্টিই নেই পুরুষের মেয়েদের মতো।

কিন্তু তুলসী তো পুরুষ নয়? তবে তার বোধশক্তি এতো ভোঁতা কেন? দৃষ্টি এমন ঝাপসা কেন? সে যে ওই মোক্ষদা কোম্পানীর 'অহরহে'র শিকার, তা' অনুভব করে না কেন? করে না। বুঝতে পারে না। ভাবে ওরা কি জানে?

ও তাই সত্যিই যখন তখন শুক্লর সেই ঘরটায় ঢোকে। পুঁথির পাতাগুলো আস্তে নাড়ে চাড়ে ধূলো ঝাড়ে, গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে কবে সেরে উঠবে কে জানে। হয়তো সারতে না সারতেই দুর্বলদেহে আবার লেখা শেষ করতে বসবে।

বলতো—সামনের ঝুলন পূর্ন্নিমেয় এ লেখা শেষ করে ফেলে, নতুন পুঁথি ধরবে।—পূর্ন্নিমেয় হয়ে না উঠলে সংক্রান্তি। ভাদ্র পড়তে দেবে না। তা ঝুলনের আর ক' দিন? এই তো এলো বলে।

বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ির রূপোর 'ঝুলনা' বেরিয়েছে, মাজাঘসা চলছে। সেদিন যখন ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়তে গিয়েছিল তুলসী দেখেছে।

বার বার প্রার্থনা করেছে, ঠাকুর, ওকে ঝুলনের মধ্যে সারিয়ে তোলো। আবার ভেবেছে ঠাকুর তো পাথরের। পাথরের কি মায়া দয়া থাকে?

বারানসী গিয়েছিলেন দেবনারায়ণ দুটো কারণে।

এক হচ্ছে মাতৃশ্রাদ্ধের বার্ষিক দিবসে মণিকর্ণিকায় মায়ের তর্পণ করতে, কারণ মা কাশীশ্বরী দেবী এই কাশীধামেই দেহ রেখেছিলেন।

প্রায় প্রতি বছরই এই দিনটিতে কাশীতে আসবার চেষ্টা করে থাকেন দেবনারায়ণ।

'মণিকর্ণিকা ঘাটে' এসে বসলেই যেন মায়ের সেই চিতাগ্নির লাল যে আলো চোখে ভাসে, দেখতে পান মায়ের শেষ কৃত্য করে কলসী করে গঙ্গাজল এনে এনে চিতাভস্ম ধুয়ে দিচ্ছে 'দেবু' নামের একটা কিশোর ছেলে।

গত বছর কী কারণে আসা হয়নি, এবারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ, বারানসীতে দেবনারায়ণের যে পরিচিত পণ্ডিত সমাজ আছেন, তাঁদের কাছে জানতে চাইবেন, এই যে শ্রীরামপুর নামক স্থানে 'মুদ্রাযন্ত্র' নামক যন্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, যার কাজ হবে গ্রন্থাদি মুদ্রণ করা। চলতি নাম 'ছাপাখানা'। সেই ছাপাখানায় ছাপা হলে, শাস্ত্র গ্রন্থগুলি অশুদ্ধ হয়ে যাবে কি না। বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবত চণ্ডী ইত্যাদি বহু সংখ্যায় ছাপা হতে থাকলে বহু ইতর জনের স্পর্শে পবিত্রতা হারাবে কিনা। পূজাদির মন্ত্র সকলের কার্যকারিতা থাকবে কি না।

এই প্রশ্নের একটি নিশ্চিত প্রত্যয় যুক্ত উত্তর পেলে, তিনি সেইটি নিয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে আলোচনা করবেন। অতঃপর গুরুদেব তো আছেনই। তবে গুরুদেব তো বংশানুক্রমে 'কুলগুরু', তাঁর যে পাণ্ডিত্য খুব বেশী আছে, তা নয়। তবু তাঁকে তো বাদ দেওয়া যায় না।

বারানসী থেকে ফিরলেন দেবনারায়ণ বেশ প্রসন্নচিত্তে। কারণ সেখানের পণ্ডিতগণের উত্তর তাঁর নিজের মনের অনুকূল। ওঁদের মতে—কাব্যগ্রন্থাদি অথবা অন্যান্য জ্ঞানের গ্রন্থাদি, যা শিক্ষার্থীর 'পাঠক্রম' হতে পারবে, সেগুলি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয় হোক, কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থ? ধর্মগ্রন্থ? মন্ত্রগ্রন্থ? বেদ উপনিষদ? নৈব নৈব চ। কখনোই নয়।

ভারতবর্ষের সমগ্র সুধী এবং পণ্ডিত সমাজের এ বিষয়ে আন্দোলন করে প্রতিবাদের ঝড় তোলা উচিত। ভারতবর্ষের হাজার হাজার

বৎসরের সুরক্ষিত ঐতিহ্য বস্তুগুলি কি ওই ম্লেচ্ছযন্ত্রের কবলে পড়ে সম্ভ্রম খোয়াবে?

দেবনারায়ণেরও এই মত।

হ্যাঁ, মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাগত জানানো হোক, ব্যবহারিক জীবনে তার দ্বারা সুবিধা হতে পারে, কিন্তু প্রাচীন পুঁথিগুলি কি তার হাতে তুলে দিতে হবে? বেদের মন্ত্র শূদ্রের স্পর্শে কলঙ্কিত হবে?

তুলোট কাগজে লেখা বারানসীর পণ্ডিত সমাজের স্বাক্ষর সম্বলিত অভিমত নিয়ে নবদ্বীপে পৌঁছলেন দেবনারায়ণ। সেখানেও আলোচনা সভায় যোগ দিলেন, তবে দেখা গেল এখানে দুটি দল হয়ে গেছে। বাঙালীর যা স্বভাব, প্রধানত দলাদলি, দ্বিতীয়ত হুজুগের স্রোতে গা ভাসানো।—

নতুন একটা কিছু এলেই বাঙালী আগে ছুটবে তাকে শাঁখ বাজিয়ে, বরণ করে নিতে।

যাক, এখন কাটোয়ার জন্য মন কেমন করছে। তা ছাড়া মস্ত একটি কাজও আছে মাথার উপর।

শুক্লশিবের ও উমারানীর বিবাহ দেওয়া, সম্পত্তির দানপত্র সম্পাদন করা, এবং তার আগে—

হ্যাঁ, তার আগে কালনার ভিটাবাড়ির কোনো এক প্রান্তে একখানি মজবুত পাতাল ঘর নির্মাণ করে ফেলে তাঁর সংগ্রহ শালায় রক্ষিত শাস্ত্র-গ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ বা পূত পবিত্র গ্রন্থগুলিকে তাম্রাধারে ভরে সেই পাতাল ঘরে স্থাপিত করা। যার প্রধান উদ্দেশ্য এগুলিকে কালের কবল হতে রক্ষা করা এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য ম্লেচ্ছ ও মুদ্রাযন্ত্র না কি পুরোপুরিই ম্লেচ্ছ সংস্পৃষ্ট শূদ্র সংস্পর্শ থেকে বাঁচানো।

কিছুও থাক।

কোনো একজনের চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব। নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাটোয়ার ঘাটে এসে নামলেন দেবনারায়ণ।

এখন চিন্তা শুরু কতদূর কি করতে পেরেছে। মনে হচ্ছে এতোদিনে অবশ্যই 'ভাগবত গ্রন্থের' কাজ সমাপ্ত করে, 'দুঃখী শ্যামাদাস' রচিত গোবিন্দ মঙ্গলে হাত দিয়েছে। ওটির কাজে শীঘ্র হাত দেবার কথা। কারণ গ্রন্থটি একটি সময়ের কড়ারে ফেরৎ দেবার কথা।

যত নিকটবর্তী হচ্ছেন কাটোয়ার ততই যেন ছেলেটার জন্যে স্নেহের সমুদ্রে জোয়ার আসছে। আহা ওই গৌরাঙ্গ সদৃশ রূপটি নিয়ে যখন বিবাহ-সভা আলোকিত করবে, তখন দেবনারায়ণেরও গৌরব কম হবে না। মনে মনে কল্পনা করলেন সেই চন্দনচর্চিত ললাট, পুষ্পমাল্য শোভিত কাঠ, রাজমুকুট সদৃশ টোপর সজ্জিত উন্নত মূর্তিটিকে।

নাঃ আর বেশী বিলম্ব করা নয়। বিংশতি বৎসর প্রায় পূর্ণ হতে চললো। উমারানীরও এখন যথার্থ কন্যাকাল।

বিনা খবরে এসেছেন, তবু ভাবলেন, যদি ঘাটে মুকুন্দ বা অন্য কোনো কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সর্বদাই তো কাজ থাকে, হয় কাটোয়া ছাড়ছে, নয় কাটোয়ায় ফিরছে।

দেখতে পেলেন না অবশ্য কাউকে।

বেলা পড়ে এসেছে, এ যাবতের সঙ্গী সঙ্গের ভৃত্যাদের তাড়া দিয়ে দ্রুত এগোতে লাগলেন।

॥ বার ॥

মুকুন্দ সরকারের গৃহে এখন স্বাভাবিক আবহাওয়া।

বিন্দুবাসিনী নাতি নিয়ে সখী গৃহ থেকে ফিরে এসেছেন, শুক্লশিব অন্ন পথ্য করেছে, মোক্ষদা কেষ্টর মা হঠাৎ ঘাড়ে পড়ে যাওয়া গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, এবং আবার তুলসী নামের মেয়েটার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। যেটা অনেক দিন স্তব্ধ ছিল। মাঝে মাঝেই বলছে, অ পিসে, ওই দেকুন জগন্নাথ কি বলচে। আপনার শিবঠাকুর না কি ঠাণ্ডা জলে চান করতে চাইচে। অ পিসে, জগন্নাথ বলচে, ঠাকুর বলেচে, তাকে আর দরকার নেই ঠাকুরের। ভাল হয়ে গেচে।

হ্যাঁ শেষ অবধি জগন্নাথকে রাখা হয়েছে রোগীর কাছে কাছে থাকতে। দুর্বল মানুষ, একা চৌকাঠ পার হতে, কি সিঁড়ির ধাপ নামতে যদি হোঁচট খায়।

মুকুন্দ বলেছিলেন, আর দু' দিন ভিতর ঘরেই থাকুক. শুক্র কিন্তু বিশেষ ব্যস্ত হচ্ছিল নিজের সেই ছোট্ট ঘরখানিতে যাবার জন্যে। বলেছে, আপনার এই বৃহৎ কক্ষে আমি যেন হারিয়ে যাই। নিজেকে খুঁজে পাই না। অধিক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে প্রশ্ন জাগে, কে আমি ?

মুকুন্দ হেসে ফেলে বলেছেন, আচ্ছা তবে ও ঘরেই যাও এবার।

তুলসী তাতে অখুসী নয়। এই ছোট্ট ঘরটার সরু দাওয়ায় এসে বসার যেন জন্মগত অধিকার আছে তুলসীর।

এখন তো আবার কাজও কমে গেছে।

শুক্কুর আর 'স্বপাক' নেই। ঠাকুরবাড়ি থেকে ভোগের প্রসাদ আসছে, সেই অন্নপথ্যের দিন থেকেই।

আর সেই প্রসাদ যখন গ্রহণ করতে বসছে তখন কর্তব্যের তাড়নায় বিন্দুবাসিনী কাছে এসে বসছেন গোরাচাঁদকে কোলে চেপে। ছেলেটা এখন আর কোলে টেপা থাকতে চায় না, নড়ে। তবু বিন্দুবাসিনী চেপে রাখেন 'ঠাকুরের' খাওয়া নষ্ট হবার ভয়ে। অবোধ শিশু যদি হঠাৎ ছুটে গিয়ে ছুঁয়ে দেয়।

এই কাজটি করে রীতিমত আত্মতৃপ্তি পান বিন্দুবাসিনী। এবং যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেন, আর একটু খাও, অ্যাতো কম খেলে শরীল সারবে কেন? এবং এও বলেন, আর তোমার রেঁদে খাওয়া চলবে না বাবা! এই ব্যাবোস্তাই বাহাল থাক। তবু তো দুটো পাঁচবেন্নুন ভাত পেটে পড়চে।

পড়বেই। ঠাকুরের ভোগ, শাক স্নুক্তো থেকে দধি পরমান্ন পর্যন্ত, উপকরণের তো ঘাট্‌তি হবার জো নেই।

বিন্দুবাসিনী কর্তব্য সেরে চলে যাবার আগেই তুলসী এসে হেসে হেসে বলে, কি ঠাকুর, মনে হচ্চে না, মোচার ঘণ্ট খেয়ে বাঁচচি, পলতা স্নুক্তো খেয়ে বাঁচচি, নারকোল কুমড়ি, মানকচুর তরকারি, মটরের ডাল, এ সবগুলো পুজুরি মশাই রাঁদে বড় খাশা, তাই না? তবু তো চালতার টক্ আমড়ার টক্ তোমার বাদ। কবরেজ মশাই বলেচেন, এখন ছ মাস টক বন্দো।

আসে শুক্লর উচ্ছিষ্ট থালাটা তুলে নিয়ে যেতে, কিন্তু তার মধ্যে কথা কয়ে যায় এক চুপড়ি।

কথা অবশ্য ওই দাওয়ায় উঠেই করে।

এই ঘরে আসার জন্যে এতো দড়ি ছেঁড়া কেন গো ঠাকুর? এক্ষুণি পুঁথি নিকতে বসতে মন বুঝি? ওটি চলবে না কবরেজ বলে—জিরেন চাই আরো দশদিন।

বলে?

বার বার বলে।

তবু সারাক্ষণ তো আর পাহারা দিচ্ছে না।

আজ বিকেলের দিকে আস্তে কুলুঙ্গীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ভেবেছিল, কতই না জানি ধূলো জমেছে, এ বেলাটা ঝাড়ামোছা করতেই যাবে। আগামীকাল সকাল থেকে শুরু করবে।—যে কাজটা হাতে নিয়েছিল, তার তো আর কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র বাকি ছিল।—কবে হয়ে যেত।

দেবনারায়ণ এসে দেখতেন 'গোবিন্দমঙ্গল'ও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বাবানসীতে রয়েছেন, তবে যে কোনো দিন তো এসে পড়তেও পারেন।

নিজের উপর ভারী রাগ হয় শুক্লর। লজ্জাও আসে।

চির সুস্থ শরীর তার। শৈশব থেকে কতো অনিয়ম অত্যাচার অনশন অর্ধাশন চলে গেছে শরীরের উপর দিয়ে কখনো কিছু হয়নি। আর এখন এই যুবা বয়সে, এ কী লজ্জা, এ কী বিপদ।—

অপরের গৃহে এ যেন উৎপাত স্বরূপ।

অর্থে সামর্থে মুকুন্দ কম পীড়িত হননি।

তবে, জীবনের একটা পরম মহৎ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হলো। কবে ভাবতে পেরেছিল এমনও ঘটে। এমন হৃদয়ও আছে জগতে।

তথাপি, বড় কুণ্ঠা এসেছে। বড় 'কিন্তু' এসেছে।

যাক আরো বেশীদিন যে ভোগেনি, এও ভালো। গঙ্গা কবিরাজ বলেছিল, এ হচ্ছে সপ্তাহান্তিক জ্বর। দ্বি সপ্তাহে জ্বর মুক্তি হলো তাই রক্ষে, না হলেই, ত্রি সপ্তাহ, এমন কি চারি পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত দৌড় দিত জ্বরাসুর। যদি ততদিন যুঝবার ক্ষমতা থাকতো। গায়ে বল তেমন না পেলেও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এবার তোড়জোড় শুরু করতে হবে।

ধূলিমালিন্যের লেশ নাই। এ সব কার কাজ তুলসী ছাড়া। আশ্চর্য !

আস্তে পুঁথিপত্রগুলি কুলুঙ্গী থেকে নামিয়ে রাখে। আস্তে সাবধানে শেষের দিকের পাতাগুলি উল্টাতে থাকে।

কিন্তু এ কী ?

এ কার হস্তাক্ষর ? এতো শুক্রর নয়।

কে লিখে রেখেছে শেষের চার পাঁচটি পাতা ?

অদ্ভুত একটা আশঙ্কার আবেশে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে।— জয়দেবের ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

শুক্লকে ব্যাধির কবলে ফেলে, এবং ভগবান কি করুণা পরবশ হয়ে তার আরব্ধ কাজ অগ্রসর করে রেখেছেন ?

আনন্দ ! না আতঙ্ক ?

আশ্চর্য ! আনন্দের পরিবর্তে আতঙ্কই হচ্ছে। যেমন ভয়াবহ কোনো ছলনা তাকে বিভ্রান্ত করতে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে রেখে কোথাও বসে মজা দেখছে।

শুক্ল মনে মনে পিছোতে থাকে।

চোখ বুজে অসুখের সেই প্রথম দিনটার প্রতিটি ক্ষণের ঘটনা চিন্তা করতে চেষ্টা করে চলে—জ্বর আসার আগে যখন ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি আর কাঁপুনির অনুভূতি চলছিল তখন কি লিখতে বসেছিল শুক্ল? অস্বাচ্ছন্দের মধ্যে লিখতে গিয়ে হস্তাক্ষর অন্যরকম হয়ে গেছে?

অতঃপর প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপে সেই স্মৃতিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে বলেই মনে পড়ছে না। কিন্তু তাই কি?

আবার সেই অপরিচিত হস্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল শুক্ল। দৃষ্টিকে যতটা বিস্ফারিত করা সম্ভব, ততটা বিস্ফারিত করে।—

কিন্তু সত্যিই কি অপরিচিত?

দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে যেন বহুবার দেখা, বহু পরিচিত। এ কী আশ্চর্য।

আমি যতটা পর্যন্ত লিখেছিলাম? এখন কি মনে করতে পারবো? অবশ্যই পারছি—মূল গ্রন্থের আর সাতটি মাত্র পৃষ্ঠা বাকি ছিল। সেই মূল গ্রন্থের যে গ্রন্থখানি দেবনারায়ণ তাঁর গুরুগৃহ থেকে নিয়ে এসে রেখেছেন, যতদিন পর্যন্ত 'নকল' করার কাজ শেষ না হয়, ততদিনের জন্য।

শুক্লর মনে পড়ছে ওই কটি সমাপ্ত করতে পারলেই, অতঃপর নিজ বংশ পরিচয়ের সঙ্গে নিজ অক্ষমতা ও ক্ষমাভিক্ষা লিপিবদ্ধ করে, এবং ছন্দবন্ধে দেবীপ্রণাম সন্নিবিষ্ট করে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে সমাপ্তি রেখা টানতে পারবে ভেবে বিশেষ হর্ষ অনুভব করেছিল।

রোগ দুর্বল শরীর, প্রায় শিহরিত কলেবর, দাঁড়িয়ে উঠে আবার কক্ষের অন্যপ্রান্তে গিয়ে কুলুঙ্গি থেকে পেড়ে এনে লেখার চৌকীর উপর নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ যেন হাঁপাল শুক্ল। তারপর সাবধানে শেষ অংশের গোছাটি উল্টোলো।

নাঃ এখানে কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। যতটা পর্যন্ত নকল হয়েছে, ঠিক সেইখানেই গোজা রয়েছে 'পত্রাঙ্ক' স্মরণে রাখার জন্যে ব্যবহৃত ছোট্ট ময়ূরপুচ্ছটুকু।

তবে?

যে আশাটুকু হচ্ছিল, হয়তো অসুস্থ অবস্থায় লেখার চেষ্টায় হস্তাক্ষর অন্য রূপ হয়ে গেছে, তাও তো নয়।

তবে?

তবে, কী এই রহস্য?

দেখতে দেখতে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল শুক্লশিব, সহসা বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ঝিলিক।

ওঃ তাই। তাই ওই অলৌকিক হস্তাক্ষরের অক্ষরের ছাঁদগুলি 'পরিচিত পরিচিত' লাগছিল। মূল গ্রন্থের অক্ষরগুলির যে ছাঁদ, এই ছাঁদ প্রায় তদ্রুপ। সেই টান, সেই কোণ, সেই মাপ, এবং যতি চিহ্নের সেই একই ভঙ্গী।

অথচ যেন অক্ষরের লেখা নয় ছবির রেখা।

সর্বাঙ্গ থর থর করে ওঠে শুক্লর।

নারায়ণ! নারায়ণ!

তবে সত্যই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দর' সেই প্রসিদ্ধ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে?

পীড়াগ্রস্ত শুক্লশিবের প্রতি সদয় করুণায় আপ্লুত হয়ে স্বয়ং নারায়ণ অথবা স্বয়ং দেবী সরস্বতী এসে নিজ হাতে তার পিছিয়ে থাকা কাজকে

অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন। তা ভিন্ন আর কি সম্ভব? না কি স্বপ্ন দেখছে সে?

মাথাটা ঝিম ঝিম করে এলো।

পুঁথির পাতা বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শুক্র নিজেও শুয়ে পড়ল পাশের শয্যায়।

কে জানে কতক্ষণ।

কে জানে চৈতন্য ছিল কি ছিল না।

হঠাৎ একটা ব্যাকুল কণ্ঠের আর্তধ্বনি অসাড় চৈতন্যকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল, ঠাকুব। অ ঠাকুর কী হল?—জগন্নাথ।

তারপরই আবও একটা ব্যাকুল কণ্ঠ, শিব। শিবচন্দ্র। কী হয়েছে? ওরে কে আছিস। একবাব কবরেজ মশাইকে খবর দে রে—

না, না, কিছু হয়নি। এমনি মাথাটা একটু—বলে উঠে বসতেই স্তম্ভিত হয়ে যায় শুক্র। পড়ন্ত বেলার প্রায়ান্ধকাব কক্ষে দুর্বল মস্তিষ্ক শুক্র কি আর এক স্বপ্ন দেখছে?

না, কোনোটাই স্বপ্ন নয়।

চির দুর্ভাগা শুক্রর জীবনে সবটাই কঠিন বাস্তব।

অথচ যদি তা হতো। যদি সবটাই স্বপ্ন হতো। সুখস্বপ্ন অথবা-দুঃস্বপ্ন।

স্বপ্ন নয়। দেবনারায়ণ মল্লিক নামের ব্যক্তিটির স্পষ্ট সত্য মূর্তি!—শুধু মূর্তিটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে না, কানের পর্দায় ধ্বনিত হয়

তার গম্ভীর কোমল কণ্ঠস্বর, অসুস্থ দেহে পুঁথির কাজে হাত দিয়েছ কেন শুক্লশিব ! উচিত হয়নি।

প্রগল্‌ভ মুকুন্দ সরকার বরাবরই বাবুর সামনে স্বল্পবাক হয়ে যান। এখনো গেলেন। তবু এটুকু বললেন, এই ভেবেই আমি তোমায় শীঘ্র এ কক্ষে চলে আসতে নিষেধ করেছিলাম ! —বাবু আপনি বসুন।

ঘরের অপর কোণ হতে আর একটা জলচৌকী মুকুন্দ নিজেই টেনে আনেন।

থাক থাক ব্যস্ত হবার দরকার নেই, বলেও চৌকীটার উপর বসেই পড়েন দেবনারায়ণ। এবং সামনের চৌকীর উপর বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকা পুঁথির পৃষ্ঠাগুলির উপর যেন সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকেন।

জগন্নাথ একসঙ্গে দুটি পিলসুজ এনে, দুটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যায়।

মল্লিক মহাশয়ের আকস্মিক আগমনের খবরটি শুক্লশিবের কাছে ব্যক্ত করে মুকুন্দ দেবনারায়ণের কাছে, নম্র বিনীত কণ্ঠে শুক্লশিবের কঠিন অসুখের কাহিনী, এবং গঙ্গা কবিরাজের অলৌকিক হাতযশের কথা নিবেদন করেন।

কিন্তু দেবনারায়ণ যেন ঈষৎ অন্যমনস্ক। যেন শুক্লশিবের এই পীড়া এবং পীড়া মুক্তির সংবাদটি তাকে যুগপৎ যতটা ব্যথিত এবং যতটা আনন্দিত করতে পারতো, ঠিক ততটা পারছে না।

তবু নানাবিধ ছোট খাটো প্রশ্ন করলেন বৈ কি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছোট খাটো উপদেশ দিলেন।

আর তারপরই হাত বাড়িয়ে পুঁথির পাতাগুলি গুছিয়ে রাখতে গিয়ে, একটু অস্থির গলায় বলে ওঠেন, একটি প্রদীপ এদিকে দেখি।

আবার মাথা ঝিম ঝিম করে আসে শুক্লর, কারণ শুক্ল শুনতে পায়, দেবনারায়ণ তীব্র বিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী ? এর ভিতর এ কার হস্তাক্ষর ?

॥ তের ॥

বিন্দুবাসিনী মনে মনে হিসেব করছিলেন দত্তক গ্রহণ উৎসবে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করবেন। তিন মেয়ে জামাই তো সসৈন্যে আসবেই। কারণ মেজ মেয়ে জামাই না এলে তো কাজই হবে না। সন্তান হস্তান্তরের দলিল প্রস্তুতের ব্যাপারে তাদের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন, তা ভিন্ন আর দুই মেয়ে জামাই বা না আসবে কেন? মা বাপের জীবনে এত্তোবড় একটা করণ কারণ। দেখবে না? খাবে মাখবে না? তা ছাড়া বিদায় কালে জোড়া জোড়া ধুতি শাড়ি. ঝোড়া ঝোড়া মিষ্টি মাষ্টি।

অবিশ্যি হিংসে করে যদি না আসে. সে আলাদা কথা।—নেমন্তন্ন তো যাবে।

ওদের ব্যাপারটা অবধারিত।

গোলমাল লাগছে পাড়ার লোককে নিয়ে। একেবারে গ্রাম সুদ্ধুই করে ফেলবেন. না কি বেছে বেছে, বিশেষ ভালবাসার পাত্রদের?

কারো সঙ্গে একটু পরামর্শ করবার জন্যে প্রাণ হাঁপায় বিন্দুবাসিনীর, কিন্তু মোক্ষদা আর কেষ্টর মা ছাড়া আর কাউকে হাতের কাছে পান না। তা' ওরা তো শোনামাত্তরই পাঁচ কান করে মরবে। চাউর করে বেড়াবে।

মুকুন্দকে বলতে গেলেই হয় হাই তোলেন অথবা বলেন এখনো তো বিলম্ব রয়েছে, এতো ব্যস্ততার কী আছে?

কিন্তু বিলম্ব কোথায় ? এই তো ভাদ্র গেলেই আশ্বিন, দেবীপক্ষ পড়লেই—শ্রাবণ মাস থাকতেই ঘটনাটি ঘটাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাদ সাধল শিবঠাকুর। রোগ করবার আর সময় পেল না। যাক ভগবানের দয়ায় বেঁচে উঠে যে মুখরক্ষা করেছে এই মঙ্গল।

সে যাক মুকুন্দ ওই অজুহাতে বলেন, এতো ব্যস্ত কি ?

আর আছে তুলসী !

তা আগে তুলসী যেমন বিন্দুবাসিনীর নেটিপেটি ছিল, এখন আর যেন তেমনটি নেই। এখন কোথায় না কোথায় কী যে করে বেড়ায় ! বাগানে কখন কি ফল ফুল হচ্ছে, তা' তোর দ্যাকবার দরকাব কি ? ঢেঁকি ঘরের 'ভানুনী' মাগী কামাই করেচে তো, তোর ঢেঁকিতে পাড় দিতে যাওয়ার কী কাজ ?—ডাল মশলা ঝেড়ে ঝুড়ে তোলবার কতা তো মোক্ষদার, তুই কেন হি হি করে কুলো পাছড়াতে যাস ?

সবেতেই না কি মজা' লাগে ওনার।

ওই সব দস্যিবিত্তি কাজে যে কিসের মজা ভগবান জানে। ওই মজার টানেই যেন বিন্দুবাসিনীর কাছ থেকে পিছলে পিছলে পালায়। আগে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরতো বিন্দুবাসিনীর।

ডেকে পাঠাবেন ভাবছিলেন, নিজেই এসে হাজির হলো। তবু ভাগ্যি।

কিন্তু এমন দুদ্দাড়িয়ে কেন ?

বলেই উঠলেন, কী হল লা তুলসী ? অমন ভূত দ্যাকার মতন ছুটে এসে হাপসে পড়লি যে ?

তুলসী আঁচল নেড়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, ভূত আর ভগবান অ্যাকই কতা।

ও আবার কী কতা হলো ?

হলো এই, ভূত না দেকি হঠাৎ ভগবানদর্শন হলো। পিসেরও যেমন ব্যাবোস্তা ! 'বাবু'কে সঙ্গ নে আসচে তো একটু গলা ঝাড়া দ্যাও। নচেৎ কাউর নাম ধরে ডাক দ্যাও। তা না একেবারে

সুমুখে এসে হাজির। আব ঠিক তখনই, তোমাদের শিবঠাকুব ভির্মি গেচে।

কী গেচে ?

ভির্মি গেচে। যাবেই তো যেমন কম্মো তেমনি ফল। এখোন চঞ্চল মাতা, এখুনেই ক্যানো লেকাপড়া কবতে যাওয়া।

বিন্দুবাসিনী বললেন, এমোন অনাছিষ্টি কতাও শুনিনি। বক্সি বলচে জিবেনেব দবকাব, আব রুগী অবাজ্যো হচ্চে। তা ভির্মি ভেঙেচে ?

তুলসী দুই হাত উল্টে অগ্রাহ্যেব গলায় বলে, সেও ওই তোমাব ওই ভগবানই জানে। তুলসী তো পিসেব পাশে সেই এ্যাক দশাসই চ্যাহাবা দেকেই ছুট মেবেচে। তা ভেঙেচে বোধায ভির্মি।

বিন্দুবাসিনী বেগে উঠে বললেন, তোব আজকাল কতাবাত্রাব কী ছিরি হয়েচে তুলসী ? না আচে বস, না আচে কস। শিবঠাকুবকেই বা আজকাল অ্যামোন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কবিস ক্যান লা ?

ওমা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আবাব কী গো পিসি। অ্যাতো যত্ন কবি তোমাব শিবঠাকুবকে, তাও মন ওটে না ?

যত্নো করো বলে মাতা কেনোনা। কেষ্টব মা বলছিলো, না কি বামুনঠাকুরেব মুকের ওপব চোটপাট কবিস।

কেষ্টব মা!

তুলসী যেন ভিতবে ভিতবে কেঁপে ওঠে। কেষ্টর মা আবার কী বলতে এলো ?

তবে কাঁপাটা দেখতে দিল না।

গম্ভীব ভঙ্গী করে বলল, ত' কেষ্টব মা যখন সব বলে। তখন আমি আব কি বলবো ?

বিন্দুবাসিনী বললেন, অ্যাখোনো হাঁপাচ্ছিস। হলো কি না? মল্লিক মশাই কি বাঘ না সিংহী।

তুলসী বলল, আমার তো মনে হল সিংহী! কী তেজী চেহারা। তা এমন হটাৎ করে এলো যে? কই কখনো তো দেকিনি।

বিন্দুবাসিনী বললেন, তোর পিসে তো ছুটে এসে বলে গ্যালো সাত রাজ্যি ঘুরে হটাৎ এসে পড়ে ঘাটে থেকেই বুঝি। কার মুকে শিবঠাকুরের ভারী ব্যামোর খবর পেয়ে সোজা চলে এসেচে। গুণের জন্যে সকলেই তো ভালবাসে ছেলেটাকে।

তুলসী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

পিসির প্রিয় প্রসঙ্গ।

মেজদি সেজদি জামাইবাবু কবে আসচে?

বিন্দুবাসিনী উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, এবং সেই প্রশ্নটি তোলেন, তোর কি মনে হয় বলতো তুলসী? গাঁ সুদ্দুকে ভোজে বলবো, না রেখে বেচে?

তুলসী আরো উৎসাহের সঙ্গে বলে, বাচাবাচির দরকার কি বাপু? ও অ্যাকেবারে ঢালাও কারবার করে ফেলো। তোমার সোনার গৌরাঙ্গর বে'র সময় থাকো না থাকো।

বুক ধড়ফড়ানি থামে তুলসীর। বিন্দুবাসিনীর হঠাৎ সন্দেহজাগা মনে শান্তির বাতাস বয়। মাগীরা বড় নিন্দেকুটে, কেবলই টুকটাক নিন্দে করতে আসবে আমার কাচে। ওই যে আমার বাপের বাড়ির দিকের মেয়েটা ছুটো খাচ্চে মাকচে। তাই গায়ে সইচে না। হতো কর্তার ভাইঝি, ওরাই জোড়হস্ত হয়ে থাকতো।

।। চোদ্দ ।।

অনেক দিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত শরীর।

আহারাদি করেই শুয়ে পড়লেন দেবনারায়ণ। ঘুম কিন্তু আসতে চাইছে না। অদ্ভুত একটা বিস্ময় মনের মধ্যে যেন একটা দুর্বোধ্য জাল রচনা করে চলেছে।

ওই আশ্চর্য দৃশ্যটা কেন হঠাৎ আমার চোখের সামনে ঝলসে উঠল।

কার ওই হাতের লেখা? এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি শুক্লশিব। কেমন যেন বিভ্রান্তের মত বলেছে, 'জানি না'।

ওই লেখা দেখেই না কি তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে উঠেছিল।

কে লিখে গেছে ওই পাঁচ পৃষ্ঠা লেখা?

বেশী প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়নি দেবনারায়ণের। ছেলেটার দুর্বল শরীর আর বিপন্ন বিব্রত অসহায় ভাব দেখে নিবৃত্ত করেছেন নিজেকে। কিন্তু নিজের মধ্যে থেকে যে প্রশ্নটাকে মুছে ফেলতে পারছেন না।

মুকুন্দ তার নিজস্ব সরল বিচারে সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল, বলেছিল, কার আবার হতে যাবে? শিবচন্দ্রের ছাড়া? রোগভোগে দুর্বল হয়ে যাওয়া দেহ, হাত কাঁপছে, হস্তাক্ষর অন্যপ্রকার হয়েছে, এখন নিজেই চিনে উঠতে পারছেন না।

কিন্তু দেবনারায়ণ অমন সহজ সমাধানটি সহজে মেনে নিতে পারেন নি। দেবনারায়ণের অভিজ্ঞ চক্ষু এক নজরেই ধরে ফেলেছে একটি পৃষ্ঠায় লিখিত শ্লোকগুলির হরফ অন্য ছাঁদের। এবং সে ছাঁদের সঙ্গে শুক্র শিবের ছাঁদের মিল আদৌ নেই। বরং রয়েছে মূল গ্রন্থের লিপিকারের। শুক্রশিবের হরফের গঠনভঙ্গী খাড়া খাড়া তীক্ষ্ণাগ্র। আর এগুলি ঈষৎ বর্তুলাকৃতি ও কোমলাগ্র।

কী এই রহস্য?

শুক্রশিবেরই বা এমন বিহ্বলভাব কেন?

হয়তো ওর কাছেও ব্যাপারটা রহস্যাবৃত বলেই। কিন্তু তার জন্যে বিস্মিত হবে, যুক্তির পথে বিচার করতে বসবে, জানতে চাইবে ওর পীড়াক্রান্ত অবস্থায় আর কেউ লেখার কাজে হাত দিয়েছিল কিনা। এমন বিহ্বল বিভ্রান্ত হবে কেন? কঠিন পীড়ায় মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো বিফলতা দেখা দিল না তো? সান্নিপাতিক জ্বরের সঙ্গে 'বিকার' এসে পড়লে এরকম ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু মুকুন্দ বলেছে 'বিকার' দেখা দেয়নি। 'ভুল বকতে' শোনা যায়নি। জ্বরের প্রভাব দুই সপ্তাহেই প্রশমিত হয়েছে।

তবু আর একটু সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ওর স্মৃতির উপর বেশী চাপ দেওয়া উচিত হবে না। অন্তত আর দুটো দিনও মস্তিষ্কের পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। কবিরাজী করেন না বটে, দেবনারায়ণ তবু কবিরাজ বংশের ছেলে তো। ভেষজের কারবারীও। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, কোন ঔষধ প্রয়োগে রোগজনিত স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা দ্রুত নিরাময় হতে পারে।

ঘুম আসছে না। দুঃখের হাসি আসছে। নিয়তি কী নিষ্ঠুর কৌতুকময়ী।

গুরুদেবের কাছে তাঁর পৌত্রীর জন্য পাত্রের কথায় আপন স্বভাবের বিপরীতে প্রায় উচ্ছ্বসিত ভাবেই পাত্রের কান্তি লাবণ্য ও রূপের কথা উল্লেখ করে এসেছেন। সংকল্প করে রেখেছেন দুর্গোৎসবের সময় গুরুদেবকে যথারীতি যখন সপরিবারে কালনার বাটিতে নিয়ে যাবেন, তখন তাদেরকে 'পাত্র'টি দেখিয়ে দেবেন। শুক্লশিবকেও অবশ্যই আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবেন। নির্মল চরিত্র 'কুমার' ব্রাহ্মণ তাঁকে তো দেবীপূজার ব্রাহ্মণ বরণে 'প্রধান' করা চলে। সে যাই হোক ঘটনার ছবিটি মনে মনে এঁকে রেখেছেন। নিজের পুত্র পুত্রবধূগণও দেখবে শুক্লশিবকে। বুঝবে বাবা বৃথা তার গুণে আকৃষ্ট হননি। রূপের সঙ্গে গুণের সমাবেশ সচরাচর ঘটে না।

কিন্তু এখন ?

এখন কোথায় সেই রূপের দীপ্তি। কোথায় সেই কান্তি লাবণ্য ! অস্থিসার দেহটার উপর একটা নিস্প্রভ রক্তহীন হলদেটে চামড়া ঢাকা, কণ্ঠের ও গণ্ডের অস্থি প্রকট, আর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় সেই চিকণ চাঁচর কুঞ্চিত কেশের সৌন্দর্যের বিলোপ।

বিকার আসতে পারে এই ভয়ে নাকি সেই সৌন্দর্যকে নির্মম চিত্তে বিদায় দিয়ে রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়ে পানা পুকুরের শীতল জল এনে মাথায় ঢালার আদেশ দিয়েছিলেন গঙ্গা কবিরাজ।

এখন ওই ন্যাড়ামাথা, শীর্ণকায় যুবককে দেখে বিশ্বাসই হতে চাইছে না, এই সেই শুক্লশিব।

চিকিৎসার দোষেও এমন ঘটে।

তীব্র ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তদুপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়াও চিকিৎসার অন্তর্গত। অভিজ্ঞ কবিরাজ কেবলমাত্র নাকি ডাবের জল মিশ্রীর জল শটি সিদ্ধ খাইয়ে দীর্ঘ তিনটি সপ্তাহ রেখে দিয়েছিল রোগীকে। তাই শোনা গেল মুকুন্দর মুখে।

তা ছাড়া এখনও তো মুস্কিল।

ছেলেটি আবার নিরামিষাশী।

একে এই যুবা বয়েস, তদুপরি এমন রিক্ত স্বাস্থ্য। এখন 'জীবিত মদগুর মৎস্যের' ঝোল, পুরাতন দাদখানি চালের অন্ন, মুগ ও মসুরডালের কাথ, এ সবের প্রয়োজন। ঠাকুর বাড়ির অন্ন প্রসাদে এর কোথায় কী ?

আমি উপস্থিত থাকলে কখনই এমনটি হতে পারত না। ভাবলেন দেবনারায়ণ। মুকুন্দর যতটা আন্তরিকতা আছে, ভালবাসা আছে, বোধবুদ্ধি ততটা নেই। দেখি আমার গৃহে আনিয়ে নিয়ে, অনুরোধ উপরোধের দ্বারা আমিষ গ্রহণ করাতে পারি কি না। বিবাহ কার্যের পূর্বে তো এ অভ্যাস বদলাতেই হবে। সেইটিই বোঝাতে হবে।

কিন্তু যতই যা করুন, পূজা তো আসন্ন।

হিসেব মত আর মাত্র চব্বিশ দিন বাকি, এই সময়টুকুর মধ্যে চেহারার কতটুকু পরিবর্তন হবে ? ন্যাড়া মাথায় সত্য কেশোদ্‌গম ! সে তো আরো কুশ্রী।

তবু কাল থেকে ওর পথ্যের সম্পর্কে চেষ্টা নেবেন দেবনারায়ণ।

ভাবছেন এসব দেবনারায়ণ।

ভেবেই চলেছেন।

কিন্তু মাঝে মাঝেই কেমন বিমনা হয়ে যাচ্ছেন।

মমতার্দ্র চিত্তের অন্তরঙ্গ স্নেহ কোমল তারটি যেমন কোমল সুরে বাজতে পারতো, ঠিক তেমনটি কোমলতায় যেন বাজছে না। হঠাৎ হঠাৎ তারটা কেমন বিকল হয়ে যাচ্ছে।—

প্রবহমান চিন্তাস্রোতের উপর দিয়ে সহসা সহসা একটি দ্রুত অপসয়মান নারীমূর্তির চকিত ছায়া ভেসে ভেসে উঠছে।

বিনিদ্র রাত কাটছে আরো একজনেরও।

কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার সমস্ত স্নায়ু শিরা চেতনা অস্তিত্ব অণু পরমাণু অস্থির, বিপর্যস্ত। বুঝতে পারছে না যন্ত্রণাটা বুকে, না মাথায়, না কি শরীরের মধ্যেই নয়, শরীরের ঊর্ধ্বে কোনো গভীর অনুভূতির সত্তায়।

পায়চারি করে বেড়াবার ক্ষমতা নেই, একটুতেই ক্লান্তি আসছে, তাই শয্যার উপরেই বসে আছে বাণবিদ্ধ মৃগের মত।

কিন্তু কিসের এই যন্ত্রণা?

বাণটা কী?

শুক্লশিব নামের এই তরুণ যুবার এখন বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকলে হয়তো বুঝতে পারতো, এ যন্ত্রণা না বোঝার। আর না বোঝার মত যন্ত্রণা আর কি আছে? বাণাহতের মত অবস্থা।

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের আলো আঁধারিতে দোদুল্যমান চিত্তটার উপর আরও একটা চাপ এসে পড়েছে, সেও বুঝতে পাবা আর না পারার যন্ত্রণাবহনকারী।

দেবনারায়ণ মল্লিক নামের দেবোপম ব্যক্তিটির আজকের মনোভাব যেন দুর্বোধ্য। বোঝা যাচ্ছে না অনেক দিন পরে এমন অকস্মাৎ এসে পড়ার জন্য, নাকি স্নেহভাজন প্রিয় ব্যক্তিটির এই যোগকাতর মূর্তিটি বিচলিত করে ফেলেছিল তাঁকে?

অথবা পুঁথির পাতায় সেই অপরিচিত হস্তাক্ষরের রহস্যের আঘাত?

শুক্ল ভাবতে চেষ্টা করে

মাত্র কয়েক দণ্ড সময়ের মধ্যে কতগুলো আকস্মিকতার আঘাত। ওই অজ্ঞানিত লিপিকারের হস্তলিপি দেখে শুক্র যখন ওই দুর্বোধ্য অজ্ঞাত রহস্যের জাল উন্মোচন করবার চেষ্টায় স্মৃতির উপর পাথরের আঘাত হেনে হেনেও হার মেনে হতাশ হয়ে গিয়ে, এক তীব্র পুলকের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে, বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে, এ আর কিছু নয়, দেবী সরস্বতীর অবিশ্বাস্য করুণা, ঠিক তন্মুহূর্তেই দেবনারায়ণের আকস্মিক আবির্ভাব।

মুকুন্দর কন্যাদের বিবাহ দিবসে আশীর্বাদ করতে আসা ছাড়া, আর কোনো দিনই দেবনারায়ণ মুকুন্দর গৃহে পদার্পণ করেন নি। কেনই বা করবেন? অথচ শুক্রর মত একটা তুচ্ছ প্রাণীর জন্যে তিনি—হায় দেবী!

তোমার এ কী কৌতুকের খেলা?

শুক্রকে কেন তুমি এমন বিভ্রান্ত করলে, যাতে সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ল।

দেবনারায়ণ যদি হঠাৎ ওভাবে এসে না পড়তেন, যদি শুক্র সহজ স্থির থাকতো, তা হলে তো ওই পুঁথিপত্রগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকতো না। এবং তদ্দণ্ডেই দেবনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো না।

একা শুক্রশিব আত্মার গভীরে, সমস্ত চিন্তা চেতনা সত্তার গভীরে প্রবেশ করে উপলব্ধির সমুদ্রে অবগাহন করে ছিঁড়ে ফেলতো ওই আলো আঁধারির রহস্যজাল, বুঝে ফেলতো কী এই ঘটনা।—তারপর তখন পরম বিশ্বাসের আলোয় মুখ মেজে প্রত্যয়ের গভীর স্বরে বলতে পারতো, এ আর কিছু নয়, 'এ হচ্ছে দেবীর করুণা কণার প্রকাশ!—এ লেখা মানুষের হাতের নয়, দেবীর করাঙ্গুলির লীলা।'

বলতে পারতো, প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি মানুষের জীবনে দেবতার কৃপার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিরল নয় অলৌকিক ঘটনার কাহিনী।

অবিশ্বাসের কি আছে ?

'গীতগোবিন্দের' সেই অতিবিখ্যাত শ্লোক 'স্মরগরল খণ্ডনং' এর ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

কিন্তু যতক্ষণ না 'প্রত্যয়ের মধ্যে নিতে পাবছে, ততক্ষণ, অপরকে বলবার মত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আসবে কোথা থেকে ? চকিত বিদ্যুৎ রেখার আলোকস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তো বিস্ময় বিমূঢ়তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

আশ্চর্য !

শুক্লশিবের মত চির আত্মস্থ ছেলেটাকে কিনা স্ত্রীলোকের মত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে লজ্জার পাথারে ডুবতে হলো।

কিন্তু এখন তো অনেক অবকাশ।

এখন তো উপলব্ধির গভীর স্তরে পৌঁছে গিয়ে পরম বিশ্বাসের বলে উঠতে পারে, না না, কোনো কাবণ অনুসন্ধানের চেষ্টার প্রয়োজন নেই। এ দেবীর করুণা।

অপার করুণা !

কিন্তু কই, শক্ত মুঠোয় ধরতে পারছে না তো শুক্ল সেই বিশ্বাসের সত্যকে। কেন আবার আলো থেকে আঁধারিতে ? কেন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে উচ্চারিত হয়ে পড়ছে, 'সত্যিই কি তা সম্ভব ?'

তবে ?

তবে দেবনারায়ণ কার কাছে পাবে সদুত্তর ?

মুকুন্দ সরকার বাহিত হয়ে অবশ্য একটা ঝাপসা 'উত্তর' উপ-ঢৌকন পেলেন দেবনারায়ণ। যেটা ঝাপসা না হলে এক অনির্বচনীয় সদুত্তর হতে পারতো। কিন্তু সেটা ঝাপসাই।

শুনে—

দেবনারায়ণ গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই তার ধারণা ?

আজ্ঞে, সেই রকমই তো বোধ হলো। মা সরস্বতী স্বয়ং এসে—

মুকুন্দ !

আজ্ঞে ! বাবু।

তুমি কাল বলছিলে না জ্বরের প্রাবল্য প্রচণ্ড হলেও, 'বিকার' এসে পড়েনি।

আজ্ঞে, তাই তো জ্বরে আচ্ছন্ন থেকেছে, কিন্তু বিকার আসেনি।

হুঁ। মুকুন্দ তুমি বোধ হয় জানো না, অনেক রোগীর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মধ্যে 'চোরা বিকার' দেখা দেয়। সেটা আরো ক্ষতিকর। মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক রকম ধারণা জন্মে জট পাকিয়ে যায়, সহজে তার জট ছাড়ানো যায় না।

জানতাম না আজ্ঞে। জগতে কত রকম ব্যাধিই আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে, ওই অলৌকিক চিন্তাটা না হয় বিকারঘটিত, কিন্তু লেখাটা ?

হুঁ। সেটা অবশ্য একটা ভাববার কথা। ও বিষয়ে তুমি উচিত মতো অনুসন্ধান করো মুকুন্দ।

তারপর স্বগতোক্তির মত বলতে থাকেন, আমারই ভুল হয়েছিল ! পুঁথি স্থানান্তর করা ঠিক হয়নি।

মুকুন্দ এসেছিল কাজের নির্দেশ নিতে।

কলিকাতার সংলগ্ন খিদিরপুর ভূকৈলাশ রাজবাটি থেকে একটি নক্সাদার প্রশস্ত পালঙ্ক ও দুইটি বৃহৎ দেরাজের বায়না এসেছে, কিন্তু তাঁদের শর্ত, খুব সংক্ষিপ্ত দিনের মধ্যেই চালান দিতে হবে। অথচ

নক্সায় যেন বিশেষ কারুকার্য থাকে। অতএব প্রশ্ন এ বায়না নেওয়া হবে কিনা, এবং হলে, কী দাম ধার্য করা হবে। এইটাই জানতে এসেছে মুকুন্দ।

দেবনারায়ণ বললেন, বায়না নেওয়া হবে কিনা সেটা তোমারই বিচার্য মুকুন্দ। তোমার হাতে এখন কি রকম কারিগর মজুত আছে তুমিই ভালো জানো। নক্সার কোনো বিশেষত্ব জানিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে, তা'ও জানিয়েছে। যে লোক এসেছিল, সে একটি সাহেবের অঙ্কিত ছবিও এনেছিল। পালঙ্কের মাথার দিকের বাজুর ওপর একটি হাত উঁচু পরীমূর্তি, পরীর সেই হাতে একটি শামাদান। আর দেরাজের উপর একখানি আয়না বসানো। সেই আয়নার মাথায় একটি উড়ন্ত পাখি।

দেবনারায়ণের ভারাক্রান্ত মনে ঈষৎ কৌতুক সঞ্চার হলো, বললেন, বায়নাদাতা মালিকের মনে হচ্ছে ওড়বার বাসনাটি প্রবল। পাখি পরী। সে যাক সময়ের সীমা কত?

বলছে, অগ্রহায়ণের প্রথমেই আবশ্যক। নাকি একটি বিবাহের উপলক্ষে।

দেবনারায়ণ বললেন, সময় অবশ্য নেহাৎ কম নয়, বেশী মজুরি করলে কারিগরদের রাজী করাতে পারলে হয়ে যেতে পারে। সবটাই তোমার উপর নির্ভর। তবে সেই 'বেশী'টা যেন নিজেদের ঘাড়ে না চাপে।

মুকুন্দ একমুখ হেসে বলেন, সে আর বলতে। তবে আজকাল সাহেবী আসবাবপত্তরের দোকানে কাজ পেয়ে পেয়ে ছুতোর ব্যাটাগুলোর যা অহঙ্কার হয়েছে, পায়ে তেল দিতে প্রাণ যায়। যার একটু হাত ভাল, তার তো চোদ্দপোয়া পায়া।

দেবনারায়ণ হাসলেন, ওই তো। ওটাই প্রায় মানুষমাত্রেরই স্বভাব। গুণের অহঙ্কারে স্ফীত হওয়া। গুণী বিনয়ী আর কটা? এতোটুকু মহিমাতেই ধরাকে সরা দেখে।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

একটি হোম শিখার মত মূর্তি চোখে ভেসে উঠেই, মনটাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে মিলিয়ে গেল।

মুকুন্দ ওই বৈলক্ষণটা লক্ষ্য না করে পূর্বকথার জের টেনে বলেন, আরও বাড়বে অহঙ্কার। বড়মানুষদের মধ্যে এখন পুরানো আসবাব-পত্তর সব বাতিল করে দিয়ে সাহেবী ফ্যাসানের আসবাবপত্তর বানানোর হিড়িক যে রকম বেড়েছে, তা'তে তো ওদেরই বাড়বাড়ন্ত। এই দেশী ছুতোরই ফরাসী সাহেবদের দোকানে ঢুকে কাজ করছে, অথচ নাম হচ্ছে দোকানের। বড়মানুষরা গর্বে ফাটছেন। আমার বাড়িতে সাহেবী দোকানের মাল।

দেবনারায়ণের সামনে এতোগুলো কথা বলে ফেলেই একটু সামলে গেলেন মুকুন্দ। তাড়াতাড়ি বললেন, তা' হলে বায়নাটা নেওয়াই ঠিক তো বাবু ?

হ্যাঁ, নিয়েই নাও। যতদিন চলে, দেশী লোকেদের ব্যবসা ক্রমশই লাটে উঠবে। বাংলা দেশের নিয়তি! বিদেশীর অলক্ষিত হাঁ তাকে গ্রাস করে ফেলতে দ্রুত এগিয়ে আসছে। অনুকরণপ্রিয় বাঙালী, আপন পরিচয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুনের পিছে ধাবিত হওয়াই তার চির লক্ষণ!—

হঠাৎ এমন বাহুল্য কথা বলছেন কেন দেবনারায়ণ? কোনো একটা কথার প্রস্তুতি? দেবনারায়ণ এমন 'দুর্বল স্নায়ু' হলেন কবে?

তাই এতোক্ষণের পর, মুকুন্দ যখন নমস্কার করে বিদায় নিচ্ছে, তখন হঠাৎ জিগ্যেস করে উঠলেন, আচ্ছা মুকুন্দ তোমার কোনো কন্যা কি পিত্রালয়ে রয়েছে?

মুকুন্দ নিশ্চয়ই এতো আলোচনার শেষে এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে বললেন, না তো। কেন?

না, কাল তোমার বাড়িতে ঢোকার সময় যেন একটি বয়স্থা মেয়েকে দেখলাম মনে হল।

মুকুন্দ বললেন, ওঃ। ওটি গৃহিণীর ভাইঝি। মা বাপ মরা।

বিধবা? না কি কুমারী?

না না। বিবাহিতা সধবা। শ্বশুর বাড়িতে দু তিনটে দজ্জাল সতীন বর্তমান। টিঁকতে দেয় না। তাই পালিয়ে এসে পিসির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। খুব কর্মকুশলা মেয়ে। পিসি তো ওর ওপরই সব ভার—

বুঝেছি। আচ্ছা এসো। কাজের ব্যাপারটায় গড়িমসি হয় না যেন।

হ্যাঁ, বৈষয়িক কাজের কথা দিয়েই কথার মুড়ি সেলাই দেওয়া ভাল। হঠাৎ না খট্‌কা লাগে মুকুন্দ সরকারের। লোকটা বিশ্বাসী সরল, কিন্তু বুদ্ধিহীন নয়।

ও চলে গেলে, আবার রাতের মতই পায়চারী শুরু করলেন দেবনারায়ণ।

শুক্লশিব ধারণা পোষণ করছে স্বয়ং মাতা বীণাপাণি তার পুঁথিতে হস্তক্ষেপ করে গেছেন। আঃ এমন বিশ্বাসী মনটা যদি দেবনারায়ণের থাকতো। কিন্তু তা' নেই। তাই সমস্যা জটিল। ভাবছেন, ওর যদি বুদ্ধিতে এ ধরনের 'বিকার' দেখা দেয় (এমন অনেকেরই দেখা দিতে দেখা গেছে) গুরুদেবের কাছে দেবনারায়ণ মুখ দেখাবেন কী করে? তিনি পৌত্রী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন।

আশ্চর্য! কতো তুচ্ছ কারণেই পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে যায়। কতো সামান্য বাতাসে যত্নে গড়া বাসনার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। গতকাল প্রভাতেও আমি একজন সুখী আর নিশ্চিন্ত ব্যক্তি ছিলাম। আমি আমার দুর্লভ গ্রন্থগুলির জন্য মনে মনে 'পাতাল ঘর' নির্মাণ করছিলাম। আর আমার এই সংগ্রহশালা, একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতে ন্যস্ত করে যেতে পারবো ভেবে পুলকিত হচ্ছিলাম।

ঈশ্বর জানেন ঘটনার রথ কোন পথে ধাবিত হবে। চিন্তা তো শুধুই একটা নয়, আরও একটা চিন্তা যেন শরীরের অজ্ঞাত ব্যাধির

প্রতিক্রিয়ার মত একটা চোরা অস্বস্তি সৃষ্টি করে একটা শান্তি চিন্তায় স্থির হতে দিচ্ছে না।

ভাবতে তো চেষ্টা করছেন, এতোই বা চিন্তা করছি কেন? বাসনার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল, এমন অশুভ চিন্তাই বা কেন? ব্যাধিজনিত হৃতলাবণ্য হৃতস্বাস্থ্য ফিরে এলেই ফিরে আসবে।

আর কেশ কলাপ? সেই বা ক' দিনের মামলা? চেষ্টা করছেন ভাবতে।

তবু—

তবু সেই একটি দ্রুত অপসৃয়মান নারী মূর্তির ছায়া, চেষ্টার উপর বাধা হেনে হেনে যাচ্ছে।

রজ্জুতে সর্পভ্রম?

কিন্তু শুধুই ছায়া? তীব্র তীক্ষ্ণ সেই একটা আর্ত কণ্ঠস্বর? সে স্বর কোন শব্দ উচ্চারণ করেছিল খেয়াল করেন নি, কিন্তু স্বরটা যে কানের পর্দা ভেদ করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বসে আছে।

নিঃশঙ্কতার দিন কোনোদিনই ছিল না। ছিল না ভয়শূন্য মুহূর্ত। তবু প্রথম প্রশ্ন ছিল খানিকটা নির্বোধের নিঃশঙ্কতা।

মনে হতো তুলসীমঞ্জুরী নামের মেয়েটার বুকের মধ্যে, কী ঘটছে না ঘটছে, কে বুঝতে পারছে? অথবা শুধু নির্বোধ ওতো নয়, নিতান্ত অবোধও। জানা ছিল না—বুকের মধ্যেকার ওই তোলপাড় কাণ্ডটার নাম কি।

কিন্তু এখনই জানে কী এর নাম ? জানে কি কেন এমন ব্যাকুল বাসনায় কোথাও এক দণ্ড তিষ্ঠোতে দেয় না তুলসীকে।

তাই ভাবে বড় সুখের ছিল সেই দিনগুলি।

যখন দিনগুলি ছিল একটি ছন্দে গাঁথা কবিতাব মত। না এমন সৌখিন ভাষায় ভাবতে জানে না তুলসী, শুধু তাব মনেব অবস্থাটাকে শৌখিন ভাষায় দাঁড় করালে এই রকমই শোনায়।

হ্যাঁ। যতদিন শুক্লশিব নিশ্ছিদ্র নিয়মের চাকায় বাঁধা হয়ে ভোব থেকে বাত পর্যন্ত এগিযে চলেছে, ততদিন, প্রতিটি দিন যেন তুলসীব কাছে নিয়ে এসেছে একটি কবে আনন্দের শতদল।

তুলসীও যেন সেই দলগুলির শরিক।

বিশৃঙ্খলা দেখা দিল মল্লিক মশাইয়ের নতুন নির্দেশে।

সর্বদা যাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বাসনার ব্যাকুল ঢেউ সেখানে বারে বাবে আছড়ে গিয়ে না পড়তে পারে ? তুলসীব জন্যে কোথায় সঞ্চিত ছিল এই অনন্ত সৌন্দর্য ? এই অগাধ ঐশ্বর্য ?

তুলসীকে এই ধূলো মাটিব পরিচিত জগৎ থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে একটা আচ্ছন্নতার জগতে। তার মাঝখানে হঠাৎ শুক্লর ওই অসুখটা যেন তুলসীর সাজানো খেলাঘরের ফোকরে ঝড়ের বাতাস ঢুকলো প্রবল বেগে। আর সেই ঝড়ের ঝাপটেই তুলসীর. অবোধের নিঃশঙ্কতা।

তুলসী যখন রোগীর ঘরে অপাংক্তেয় হয়ে গেল, আর বীরদর্পে আসন দখল করলো ছটো ঝুনো মেয়েমানুষ তখন তাদের ছু জোড়া

ঝুনো চোখের দৃষ্টির মধ্যে থেকেই তুলসী আবিষ্কার করলো বুকের মধ্যেকার তোলপাড়ও অন্যের চোখে ধরা পড়ে।

কিন্তু কী নির্লজ্জ ওদের সেই দৃষ্টির ভাষা।

তবুও সেই আচ্ছন্নের জগৎ বার বার হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। তখন মনকে চোখঠারা, ঠাকুর তো অন্য ঘরে। খালি ঘরটায় এসে একটু দেখাশোনা করতে দোষ কী?

তারপর?

তারপর আর এক আচ্ছন্নতায় সেই অসম সাহসিক চিন্তা, যে চিন্তাটাকে ধীরে ধীরে তিলে তিলে মূর্তি দিয়েছে তুলসী। সেই মূর্তি গড়ায় কী অপূর্ব অনাস্বাদিত আনন্দের স্বাদ।

প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে কবে আসবে সেই মূর্তি উন্মোচনের লগ্ন। তুলসী জানে সেই উন্মোচনের লগ্নে তুলসীর কাছে পুরস্কার এসে পৌঁছবে এক জোড়া বিস্ময়ে পুলকিত সপ্রশংস দৃষ্টি।

সেই দৃষ্টিটুকুই তো পুষ্পমাল্য। অভিনন্দন পত্র। কবে আসবে সেই শুভক্ষণ?

এলো।

তুলসীর প্রার্থিত শুভক্ষণের সুযোগ।

কী একটা ব্রতপালা উপলক্ষে পাড়াসুদ্ধু মহিলা রওনা দিয়েছেন কোথাকার যেন—ইচ্ছাময়ীতলায়।

যার যা ইচ্ছা, সেইটি মনে মনে 'ইচ্ছাময়ী' তলায় রেখে আসতে হয় একটি মাটির ঘটে। ইচ্ছাময়ী অবসর সময়ে পূর্ণ করে রাখেন সেই ঘট।

বিন্দুবাসিনী কুমোর বাড়ি থেকে ঘট আনবার সময় জিগ্যেস করেছিলেন, তুলসী তুই যাবি? তা'লে আর একটা ঘট আনাই?

তুলসী, বিন্দুবাসিনীর সঙ্গিনীগুলির মুখ মনে করল। যাদের মধ্যে মোক্ষদা এবং কেষ্টর মা'র বিশেষ ভূমিকা।

তুলসী বলল, আমার আবার কিসের ইচ্ছে?

ওমা! মানুষ মাত্তরেরই ইচ্ছে থাকে। ভেবে গ্যাক না। তা'লে চল আমাদের সঙ্গে।

তুলসী হি হি করে হেসে বলল, আমার যা ইচ্ছে সেটা কি আর ঠাকুরের কাছে স্বীকার করতে আচে?

শোনো কথা। ঠাকুর আর কী না জানচে? তো বল্‌না, কী ইচ্ছে? ঘটের মধ্যে চুপি চুপি সেই কতাটা বলে—বটপাতা চাপা দে চলে আসতে হবে।

যা মনের ইচ্ছে? তুলসী হেসে গড়িয়ে বলল, আমার ইচ্ছে সতীন জোড়া পটল তুলুক। তো একটা ঘটে হবে? না দুটো ঘট লাগবে?

দুগ্‌গা, দুগ্‌গা। ও কি কতার ছিরি তুলসী? ঠাকুর নিয়ে গ্যাকরা?

'বাঃ। তুমি বললে, ভেবে গ্যাক। তা' ভেবে দেকচি, এছাড়া অ্যাখোন আর কিচু—

থাম। বুড়ি হাবড়িদের মধ্যে যাবিনে তাই বল। বিন্দুবাসিনী বললেন, পালকিতে যাচ্ছিলাম—

পালকিতে এতো সবাই—

ওমা আমি কোতা যাব? এতো সবাই পালকিতে?

কার এ্যাতো পয়সা আছে। আমার গোরাচাঁদ যাবে বলেই তো পালকির কতা বলে যেতে বলেচি তোর পিসেকে। তো রাগ গ্যাকে

কে। বলে কি না, 'শকের কাজল' পরেচো, এখন বোজো ঠ্যালা। আচ্ছা ও আমায় ছেড়ে অ্যাকদণ্ড থাকে? বল তুই?

তুলসী মহোৎসাহে বলল, তা আবার নয়? রেগে গেলে রক্ষে রাকবে? কেঁদে বাড়ি ভাসাবে।

এই তো তুই বুঝলি। ওই এক বগ্‌গা মানুষটি যদি কিচু বোজে।

হৃষ্টচিত্তে গোরাচাঁদকে সাজাতে যান বিন্দুবাসিনী। নজর লাগার ভয়টি বিলক্ষণ, তবু সাজানোও চাই।

পালকি এসে দাঁড়ায়।

তুলসীর হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে থাকে।

।। পনের ।।

ছুতো একটা আবিষ্কার করা চাই। তবে শক্ত হয় না সেটা।

শুক্লর সকালে কেচে দেওয়া ধুতি আর উত্তরীয়টি তো শুকিয়ে গেছে, তুলে ঘরে রেখে আসা অযৌক্তিক নয়।

শুক্ল তাকিয়ে দেখল।

শুক্লর মুখের রেখায় ক্ষোভ অভিমান।

তুলসী, দু' দিন ধরে তোমায় একটা কথা জিগেস করবো ভাবছি। তা' তুমি আর—

তুলসীর ভিতরে আবাব সেই তোলপাড়। তবু বাইরে তো সহজ থাকতে হবে।

ওমা, তা' আমি জানি? সর্বদা জগন্নাথ ঘোরে, তাই আর—তা' ওকে দিয়ে ডাকলে হতো।

বলছিলাম, অসুখের সময় আমায় যখন ওই ভেতর ঘরে থাকতে হতো, তখন এ ঘরে বাইরের আর কেউ আসতো বসতো?

তুলসীর ভিতরটা কেঁপে উঠল। আনন্দে, আবেগে, আশায়, প্রত্যাশায়।

এসে গেছে সেই পরমলগ্ন। তুলসীর জন্যে ফুটে উঠবে একটি খুশীর হাসির শতদল পদ্ম। জ্বলে উঠবে একটি প্রশংসা—দৃষ্টির স্নিগ্ধ প্রদীপ।

কাঁপা গলাটা সামলে বলল, না তো কেউ না। এ কতা ক্যানো ?

শুক্রু যেন কেমন আবছা গলায় বলল, কেন ? একটা ভাবনা নিয়ে বড় খট্‌কায় পড়েছি।

খট্‌কা ?

তুলসীর মনের মধ্যে হাসির হিল্লোল। তা' খট্‌কাই বটে।

শুক্রুর কণ্ঠে দ্বিধা! ঠিক বলছ আমার অসাক্ষাতে কেউ আসেনি ?

তুলসী মাথা নীচু করে বলল, আমি ছাড়া আর কেউ আসেনি। আমি ঘর পোস্‌কের করতে—

তুমি। তা'তে কিছু না! ঠিক বলছ ? আর কেউ না ?

তুলসী একটু অবাক হয়। হতাশও।

এতোদিন ধরে মনের মধ্যে তিল তিল করে ছবিটি এঁকেছিল সেই ছবির মানুষের মুখে যে কথাগুলো বসিয়েছিল, তার সঙ্গে তো এ ছবি ঠিক মিলছে না।

এই সামান্য প্রশ্নটায় এতো অস্থিরতা কেন ঠাকুরের ? এতো উত্তেজনা ? যেন ওর উত্তরটার মধ্যেই জীবন মরণ নির্ভর করছে ঠাকুরের। কেন রে বাবা।

তুলসীর দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর, আমি ছাড়া আর কেউ আসেনি। মাচিটা অবদি না।

ঠিক। ঠিক বলছো ? ভাল করে মনে করে দ্যাখো। যদি তোমার অজানতে কেউ—

তুলসী বুঝতে পারে না, এই তুচ্ছ কথাটা নিয়ে এতো ক্ষ্যাপামি কেন ঠাকুরের।

বেশ জোর গলায় বলে ওঠে, আমার অজানতে ? এলেই হলো ? আমার কাচে কুলুপ চাবি। বলচি তো আমি ভেন্ন আর কেউ আসেনি।

তুলসী।

বেটাছেলের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে নেই, এ কথা জানে তুলসী। কিন্তু সব সময় মানে না। মানতে পারে না। তাই তুলসী দেখতে পেল, তুলসী বলে ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখটায় যেন একটা আলো ফুটে উঠল। মুখটা জ্বলজ্বলে দেখাল। যেমন জ্বলজ্বলে দেখায় 'সন্ধ্যে আরুতিব' সময় বিন্দাবন চন্দরের মুখটা।

সেই মুখটা থেকে একটা শব্দ স্খলিত হযে পড়ল, এসেছিল। স্খলিত হয়ে পড়া শব্দ। তবু নিশ্চিত বিশ্বাসের।

এসে ছেলো! তুলসী যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ এসেছিলো। ঘরে ঢুকেছিল।

ঢুকে—ঢুকে—তুলসী।

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক কাজ করে বসে শুক্র। হাত বাড়িয়ে তুলসীর কাঁধের একটা কোণ চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, যিনি এসেছিলেন, তালা চাবি তাঁকে আটকাতে পারে না। স্বয়ং দেবী সরস্বতী এসেছিলেন।

এ কী। এ কোন কথা। তুলসী ভয় পায়।

কাঁধের ওই স্পর্শটা ক্ষণিকের। কিন্তু যেন লেগে রয়েছে। হয়তো চিরকালের জন্যে লেগে থাকবে। তবু তুলসী ওই বিহ্বল মুখটার দিকে তাকিযে ভয়ের গলায় বলে, ঠাকুর মুকে মাতায় একটু জল দেবে?

তুমি কি ভাবছ আমার মাথা গরম হয়ে গেছে? না তুলসী, ঠিকই আছি আমি। বড়ো খট্‌কায় ছিলাম, তুমি আমায় বাঁচালে। এই অধম সন্তানের ওপর দেবীর অসীম কৃপা। অসুখে লেখা বন্ধ হওয়ায় আমার কষ্ট দেখে দেবী নিজে এসে আমার পুঁথির পাতা লিখে দিয়ে গেছেন। এই ভাখো—

শুক্রর সকল সন্দেহ নিরসন হয়ে গেছে।

সকল দ্বিধার অবসান। বিশ্বাসের আলোয় দীপ্যমান মুখ, শুক্লশিব আস্তে পেড়ে আনে সেই পুঁথি। খুলে ধরে সেই পাতা। এই ছ্যাখো, মা সরস্বতীর কলমের লিখন—

'মা সরস্বতী'। তুলসী পাথর হয়ে যায়। আবার তুলসী অস্থিরও হয়ে ওঠে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা। নারায়ণ নারায়ণ।

দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণতি জানিয়ে ঘাড় নীচু করে বলে তুলসী, ঠাকুর, ও নেকা মা সরস্বতীর নয়।

নয়? বললেই হল? কে বলেছে নয়? আমি যে অহরহ মনের মধ্যে মা'র বীণাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—

আমায় মাপ করো ঠাকুর। ও নেকা তুলসী মুখপুড়ির।

সহসা কি ভূমিকম্প হল?·· যে ভূমিকম্পে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে তলিয়ে যাবার গহ্বর দেখায়।

তুলসী! আমি তোমার তামাসার পাত্র নই।

ঠাকুর তোমার পায়ে ধরছি, তামাসা নয়। তোমার ব্যামোর সময় আমিই একটু একটু করে—

শুক্ল এখন বসে পড়েছে।

শুক্লর সামনে খোলা পড়ে রয়েছে সেই অভিশপ্ত পুঁথি।

তুলসী। তোমার কি হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে?

জানি না ঠাকুর। দোষ ভেবে করিনি। দুম্মতি হয়েছিলো তাই—

শুক্ল যেন ডুবন্ত নদীর হালছাড়া মাঝি।

তুলসী, তুমি বুঝতে পারছো, কী নির্বোধের মত কথা বলছো তুমি। তুমি এই পুঁথির পাতাগুলি নকল করেছ, এই কথা বিশ্বাস করবো আমি? তুমি অক্ষর চেনো?

তুলসীর ঘাড় হেঁট ছিল। তুলসী মুখ তুলল।

'ওক্‌খোর' কি তাই তো জানি না ঠাকুর।

তবে? তবে তুমি কী করে বলে যাচ্ছো তুমি লিখেছ। লিখতে পড়তে না জানলে—

শুক্ল সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরতে যাচ্ছে।

তুলসী নিশ্চয়ই ভুল ভান করে এলোমেলো কথা বলছে।

কিন্তু তুলসী এলোমেলো হয়ে যায়নি। তুলসী শুধু ভয় পাচ্ছে! ভয় পাচ্ছে ঠাকুর তার দুর্মতির খেয়ালের কাজটাকে মা সরস্বতীর বলে ভেবে বসে আছে।

দুর্মতি। এখন বুঝতে পাচ্ছে।

কিন্তু তখন?

তখন ভেবেছিল ঠাকুরের কাজটা খানিক এগিয়ে গেছে দেখে আহ্লাদ করবে ঠাকুর। সেই আশায়, সেই স্বপ্নে, তিল তিল করে—

তুলসী আমার কথার জবাব দাও। তুমি নিজেই বললে লেখাপড়া জানো না, অক্ষর কাকে বলে তাই জানো না। তবে কেন বলছ এমন অলীক কথা। কেন বলছ তুমি লিখেছ?

ঠাকুরের এমন কঠোর কণ্ঠ।

তুলসীর চোখ ফেটে জল আসে। তবু কষ্টে শান্ত হয়ে বলে, দেকে দেখে এঁকেচি। যেমন আল্পনা আঁকি—মাচ, পাকি, ফুল আঁকি।

কেন করতে গেলে তুলসী? কেন এমন করতে গেলে?

ভাবনু তোমার কাজ কমে যাবে। রোগা শরীল—

শুক্ল স্তব্ধ হয়ে যায়।

তাকিয়ে থাকেই মুখ নীচু করা মুখটার দিকে। যার আনত চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে মাটিতে পড়ছে।

ভিতরটা মুচড়ে উঠল শুক্লর। বড় রূঢ় ভাবে কথা বলা হয়ে গেছে। নিতান্ত অবোধ বলেই না—

আচ্ছা। কী করে সম্ভব হল?

শুধু দেখে দেখে আলপনা কাটার মত, ফুল পাখী আঁকার এমন নিখুঁৎ আখরে এমন নিভুর্ল লিখে তোলা যায় এতোগুলো পাতা। পাঁচ; হ্যাঁ পাঁচখানা—কেউ কখনো এমন অসম্ভব কথা শুনেছে? শুনেছে এমন অসাধ্য সাধনের কাহিনী?

শুক্লা! তবে তুমি কেন ভাবছ না, এ দেবীরই ছলনা, দেবীরই প্রেরণা। তিনি তাঁর কৃপার এক কণা ওই অবোধ সরল নিরক্ষর মেয়েটার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দেবীর কৃপা না পেলে একটা নিরক্ষর মেয়ে এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে সংস্কৃত অক্ষরগুলি?

কিন্তু—

শুক্লা, শুধু তুমি ভাবলেই তো হ'ল না। পৃথিবীর দৃষ্টি কুলিশ কঠোর। তোমার জীবনের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল শুক্লা।

চোখের জল পড়ে পড়ে এক সময় থামে।

তুলসী চোখ মুছে ওই পাথর হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। এখন বুঝতে পারছে ভয়ঙ্কর একটা দোষ করে ফেলেছে সে। বুকের মধ্যে ডুকরে ডুকরে কান্না ওঠে, আর থাকতে পারে না। হঠাৎ শুক্লার পায়ের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে বলে ওঠে, ঠাকুর তুমি আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফ্যালো, অমন ধারা মুক করে থেকো না। আর কক্ষনো অ্যামোন কাজ করবো না।

শুক্ল আস্তে বলে. আর ককখনোর কথা ওঠে না তুলসী। তুমি বুঝবে না, কী সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। আমার জীবন চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

অ্যাঁ।

উপুড় হয়ে বসে থাকা তুলসী হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, তবে আমার মরাই ভালো। গঙ্গায় ঝাঁপ দিইগে আমি—

আঃ তুলসী। সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ ঘটিও না। আমার দিব্যি যদি তুমি—

তোমার দিব্যি! তোমার দিব্যি দিলে আমায়!

হ্যাঁ। অমন পাপচিন্তা মনে এনো না কোনোদিন। হঠাৎ বিচলিত হয়ে তোমায় বড় রূঢ় কথা বলে ফেলেছি, মার্জনা কোরো।

শুধু দুটো রূঢ়ো কথা? ঠাকুর তুমি আমায় মারলে না কেন —

তুলসী।

ঘরের সামনে সহসা বাজ পড়ে।

বাড়িতে কেউ কোথাও নেই, তুই ওখানে কী করছিস লক্ষ্মীছাড়ি?

মুকুন্দর কণ্ঠ—এমন স্বর। ভিতরের দৃশ্যটা অবলোকন করেন মুকুন্দ।

আরো কুলিশ কঠিন গলায় বলেন, হারামজাদা মেয়ে, তোমায় আমি 'সৎ' বলে জানতাম! একা পেয়ে ভালোমানুষ বামুনের ছেলেটাকে তুমি—ওঃ। দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষছি আমি।

দেবনারায়ণ বললেন, 'অবোধ' বললেই তো ক্ষতির পূরণ হয়ে যায় না মুকুন্দ। হনুমানের ল্যাজের আগুনে, লঙ্কাপুরী পোড়ে। গঙ্গায়

আত্মবিসর্জন করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। আমার এই এতোদিনের আশা আর ওই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ তনয়ের এই বৎসরাধিক কালের নিষ্ঠা আর শ্রম সবই বৃথা হয়ে গেল।

মুকুন্দর মুখে কথা জোগায় না, তবু সাহসে ভর করে বলে ফেলেন, ওই পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে—

ছিঃ।

দেবনারায়ণের ধিক্কারের গলা তীব্র হয়, শুধু ওই পৃষ্ঠাগুলি ?—ওই শূদ্রস্পর্শিত অপবিত্র কলঙ্কিত ভাগবত গ্রন্থখানা আর আমার কোন কাজে লাগবে ? শুধু শূদ্রই নয়, শূদ্র স্ত্রীলোক—ভাবতে পারছি না মুকুন্দ, যে গ্রন্থের জন্যে আমি তালপত্রগুলিকে আগে গঙ্গাজলে ধৌত করে নিয়ে, তবে ব্যবহার করতে দিয়েছি, তার এই পরিণাম ঘটলো ! কূলে এসে তরী ডুবলো !—উঃ ওই দুঃসাহসী ধৃষ্ট মেয়েছেলেটার উপযুক্ত শাস্তি আমি ভেবে পাচ্ছি না।

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি বলেন তার শাস্তি সাধন কালই হয়ে গেছে বাবু। তার সেই দজ্জাল সতীনদের কাছে চালান করে দিয়েছি। তো ভেবেছিলাম কেঁদে কেটে এ্যাকসা করবে। ভয়ে ডরে করেনি কিছু। কাঠ পাথরের মতন গো গাড়িতে গিয়ে চেপে বসল।

মুকুন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, এমনিতে মেয়েটার অনেক গুণ ছিলো।

দেবনারায়ণ চকিত হলেন। তাকিয়ে দেখলেন বেদনার্ত মুখটার দিকে।

দেবনারায়ণেরও বোধকরি অজ্ঞাতসারেই একটা নিঃশ্বাস পড়ল। আস্তে বললেন, সেটা তো দেখলামই। অক্ষর চেনে না, শুধু দেখে

দেখে—এভাবে নকল করা। তাজ্জব। বিশ্বাস হ'তে সময় লেগেছিল। কিন্তু মেয়েছেলের গুণ। নিষ্ফলা গুণ।

আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শুক্লশিব কি চলে যাওয়াটাই নিশ্চিত স্থির করল? বলে দেখেছিলে আর একটু ভেবে দেখতে—

মুকুন্দ মলিন মুখে বললেন, বলেছি। অনেক বলেছি। কথা দাঁড়ায়নি। বড় মর্মাহত হয়ে গেছে। নিজের মধ্যেই লজ্জা অপমান ধিক্কার। সরল বিশ্বাসে ভেবেছিল বুঝি দেবী বীণাপাণি স্বয়ং এসে— কিন্তু এখন বোধহয় মনে করছে লোকে ওকে মিথ্যাবাদী ধাপ্পাবাজ ভাবছে।

না না। তা' কেউ ভাববে না ওকে।

দেবনারায়ণ গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, সবই আমার বিধিলিপি।

॥ ষোলো ॥

দেবনারায়ণ মল্লিকের সেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল শুক্লশিব। হাতে কিছু গ্রন্থ। যেগুলি পাঠের জন্য নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, এগুলি আমার কাছে ছিল।

কৃশদেহ মুণ্ডিত মস্তক যুবক, এ যেন আর কেউ।

দেবনারায়ণ তাকিয়ে দেখলেন।

আর হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। চিরদিনের আত্মস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ দেবনারায়ণের চোখের মধ্যে থেকে এক ঝলক গরম জল উপছে এলো। এ কি! তবে কি বার্ধক্য এসে গেল তাঁর?

দেবনারায়ণের স্ত্রীর মৃত্যুকালেও তো এমন ঘটনা ঘটেনি। অবিচলিত মুখে ছেলেদের যথা কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

যাক, ধরা পড়লেন না। সামলে নিলেন।

শান্ত গলায় বললেন, আর একবার চিন্তা করে দেখা কি কোনোমতেই সম্ভব নয়?

শুক্লর কণ্ঠ আরো মৃদু হয়ে এলো, মনকে একভাবে প্রস্তুত করে নিয়েছি—

দেবনারায়ণ কাছে সরে এলেন, খুব কাছে, প্রায় যেন মিনতির সঙ্গে বললেন, মুকুন্দর কাছে আমি প্রকৃত ইতিহাস জেনেছি শুক্লশিব। তোমার তো কোনো দোষ নেই। একটা বুদ্ধিহীন মেয়ের বুদ্ধিহীনতার ফলে—কিন্তু সে যাক জীবনে এমন অনেক বাধা বিপত্তি আসে, অনেক

ঝড় ঝঞ্ঝা কাটিয়ে এগোতে হয়। জীবন মানেই 'সংগ্রাম'। এই গ্লানির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ কর শুক্র। তোমার বয়েস কম, সামনে অগাধ ক্ষেত্র।

শুক্র মুখ না তুলেই অস্ফুটে বলে, আর সম্ভব নয়।

শুক্র, তবু বলছি ভেবে দেখো। মনে পড়ে একদিন তুমি আমার এই গ্রন্থাগারে বসে বলেছিলে, 'আমায় যদি কেউ খেতেও না দেয়, শুধু এইখানে পড়ে থাকতে দেয়, জীবন কাটিয়ে দিতে পারি।

নিরুত্তর শুক্রর মাথাটা আরো নীচু হলো।

দেবনারায়ণ আরো কাছে সরে এলেন, আস্তে ওর কাঁধটায় একটু হাত ঠেকিয়ে, হতাশ বিষণ্ণ গলায় বললেন, প্রত্যাশা ছিল আমার এই প্রাণতুল্য সংগ্রহশালাটি একজন উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো।

আমি অকৃতজ্ঞ। এই অনন্ত স্নেহের যোগ্য নই।

দু' দুটো গাঢ় গভীর দীর্ঘশ্বাসে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

এখন কোথায় যাবে স্থির করেছ ?

আপাততঃ নবদ্বীপে যাবো ভাবছি। সেই পথেই তো চলছিলাম, ক্ষুব্ধ একটু হাসির আভাস যেন কথাটাকে সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা দিল।

দেবনারায়ণ একটা চৌকীতে বসে পড়ে বললেন, ক্রমশঃই পুঁথি নকলের কাজে ভাঁটা পড়ে আসছে। মুদ্রাযন্ত্রের দ্রুত প্রসার ঘটবে মনে হয়। পুঁথির দিন শেষ হয়ে এলো। কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত।

শুক্র চুপ করে থাকে।

মনে মনে হয়তো বলে, দেখি, নিয়তি আবার কোথায় নিক্ষেপ করে। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত মানুষটার সামনে এসব কথা উচ্চারণ করা চলে না।

দেবনারায়ণ একটু অপেক্ষা করে বললেন, থাক, যা মনস্থ করেছ, তাই হোক। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। নিয়ত তাঁর আশীর্বাদ থাকুক --

আপনিও আশীর্বাদ করুন—

এ কী, ছি ছি, ব্রাহ্মণকে আর আশীবাদ কি করবো। মঙ্গল কামনা করছি। এখন এই মুদ্রা থলিটি সঙ্গে রাখো।

একটি শালুর তৈরী থলি হাতে করলেন।

আমায় ক্ষমা করবেন।

এ কী বলছ শুক্রশিব। তুমি কি পাগল? অর্থের প্রয়োজন সব সময়। নিঃস্ব হাতে পথে বার হবে?

নিঃস্ব হাতেই তো এসেছিলাম। সারা জীবন তো সেই ভাবেই—

শুক্রশিব! তোমার তো কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই। তোমার পরিশ্রমের দক্ষিণা স্বরূপ তো তোমার অনেকই প্রাপ্য হয়।

এতোক্ষণ ঘাড় নীচুই ছিল। শুক্র হঠাৎ মুখ তুলল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে তাকাল। গভীর গলায় বলল, যে কাজ সমাপ্ত করতে পারি নি, তার দক্ষিণা নেওয়া চলে না।

সমাপ্ত হয়নি আমার অদৃষ্টে, আর নিয়তির পাকচক্রে। কিন্তু শ্রম তো করেছ এতোদিন ধরে।

তার পরিবর্তে অনেক পেয়েছি। অনেক। অনেক। সেই সম্বল নিয়েই—

হাতের বইগুলি নামিয়ে রাখে।

একটু থেমে বলল, যদি কিছু দিতেই চান, তবে একটি জিনিস প্রার্থনা করছি।

বলো, বলো শুক্রশিব, অকুণ্ঠায় বলো। তোমায় অদেয় আমার কিছু নেই।

অকুণ্ঠায় বলার আশ্বাস পেয়েও শুক্রর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে আসে। বলছিলাম, ওই অসমাপ্ত পুঁথিটি তো আপনার কোনো কাজে লাগছে না, যদি আমায় সঙ্গে নিতে দেন।

এইমাত্র ? আর কিছু না ?

দেবনারায়ণের কণ্ঠ থেকে ক্ষুব্ধ হতাশার স্বর ঝরে পড়ল।

না, আর কিছু নয়।

বেশ, কোথায় আছে সেটি ?

সরকার মশাইয়ের গৃহেই রয়েছে।

উত্তম। সঙ্গে নাও। কখন রওনা দেবে ?

এই এখনই।

আচ্ছা ! যাত্রা শুভ হোক। মঙ্গলময় মঙ্গল করুন। নারায়ণ ! নারায়ণ !

অপস্রিয়মান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ক্ষুব্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে ভাবলেন দেবনারায়ণ, 'যুগের পরিবর্তনের প্রভাবে শাস্ত্রবাক্যসমূহ মিথ্যা হয়ে যায়' এটা শাস্ত্রেরই বাক্য, কিন্তু শাস্ত্রের সেই 'ঘৃত আর অগ্নি' সম্পর্কিত অমোঘ বাণী কোনো দিনই মিথ্যা হয়ে যাবে না, যুগে যুগে কালে কালে, মৃত্যুর মতই চির সত্য বহন করে চলবে।

॥ সতের ॥

এ বাড়ির বিদায় পর্ব সারা হয়ে গেছে। শুধু নৌকো ঘাটে আসার অপেক্ষা। সেই পুরনো বেতের পেটিকাটি নিয়ে আবার লক্ষ্যহীন যাত্রার পথে পাড়ি। নিজস্ব পুরানো বস্তুগুলি ছাড়া আর কিছুই নিচ্ছে না শুক্র, শুধু পেটিকার অভ্যন্তরে ভরা আছে একটি নতুন বস্তু। 'তুলসী মঞ্জুরী' নামের সেই বেহায়া মেয়েটা এতো কাণ্ডের পরেও, (যাকে না কি হঠাৎ 'স্বামীর অসুখ' শুনে তক্ষুনি চলে যেতে হচ্ছে) গোরুর গাড়ি চড়তে যেতে, কোন ফাঁকে 'চুরি করে এসে বলে গিয়েছিল তুমি তো আমায় দিব্যি দে' হাত পা বেঁদে রেকে দিয়েচো ঠাকুর, প্রাণ গেলেও মরতে পারব না। তোমাকেও দিব্যি দিয়ে যাচ্চি, তোমার পেঁটরিতে একটি জিনিস রইলো, টানমেরে ফেলে দিও না, ব্যাভার কোরো। মনে জেনো, ওর ভেতরে এই লক্ষ্মীছাড়ি তুলসীর মনপ্রাণটা বিচোনো আচে। আমি বিদেয় হলে দেকো।

দেখেছিল তাই।

গভীর রাত্রে, প্রদীপের শিখা বাড়িয়ে যখন বেতের সেই পেটিকাটির মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছিল নিজের যৎসামান্য জিনিস, আর নিজস্ব পুঁথি পত্রগুলি তখন বার করে দেখেছিল পেটিকার মধ্যে তলার দিকে পাট করে রেখে দেওয়া সেই জিনিসটি। কী এ? ধুতি? উত্তরীয়?

ধবধবে শাদা ন্যাকড়ায় মোড়া সেই জিনিসটি পাট খুলে চৌকীর উপর বিছিয়ে ধরে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শুক্ল। মস্ত বড় সেই কাঁথাখানা। বহু বিচিত্র নক্সা তুলে তুলে অনেক দিন ধরে যেটা বানিয়েছিল তুলসী, তিল তিল করে। সেটা শুক্লর জন্যে! এর মধ্যেই তাহলে তুলসীর মন প্রাণ বিছোনো আছে?

বহুক্ষণ নিথর হয়ে বসে দেখেছে। কী অপূর্ব সেলাইয়ের বাহার।

ছুঁচের কাজ না তুলির কাজ? তাই বলেছিল, যেমন ফুল আঁকি, পাখি আঁকি, মাছ আঁকি, তেমনি—হাঁ। তেমনি করে অক্ষর—এঁকেছিল তুলসী। পরিণাম বুঝতে পারেনি।

প্রদীপটা হাতে তুলে নিরীক্ষণ করে দেখে শুক্ল, আর দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এ কোন নক্সা?

মাছ নয়, পাখি ফুল নয়। একধারে কোণাকুণি—শুক্লশিবের কলমের টানের ছাঁদে লেখা—

'তুলসীমঞ্জুরী'।

অবিকল শুক্লর ছাঁদ।

একদা কাঠের সেই সরু পাটাটার উপর কাঠ কয়লা দিয়ে লেখা হয়েছিল যেটা।

সেটাকে টকটকে লাল সুতোয় ছুঁচের আগায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রাত্রে তারপর ভাঁজ করে পেঁটরীর মধ্যে রেখে দিয়েছিল কাঁথাটা নীচের দিকে।—এখন অভিশপ্ত পুঁথিখানাকে আস্তে ঢুকিয়ে রাখল তারাই ভাঁজের মধ্যে।

এইবার আবার নৌকোয় গিয়ে চড়ে বসা! আবার অজানা স্রোতে ভাসা।

:-: সমাপ্ত :-: